সপ্তদশ বর্ষ সংখ্যা

১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রত্রিকা

সপ্তদশ বর্ষ সংখ্যা ১৪২৪বঙ্গাব্দ/২০১৭খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ	সভাপতি
ড. মোঃ মিজানুর রহমান	সদস্য
ড. মেহেদী মাসুদ	সদস্য
ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম	সদস্য
ড. মোঃ মোরশেদ আলম	সদস্য

সম্পাদক: ড. মোঃ শফিকুল হক

সহকারী সম্পাদক: মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা ১৩৪৩

www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রত্রিকা, সপ্তদশ বর্ষ সংখ্যা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 17th Year Issue 1424/2017

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

©বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকৃত প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৪২৫/জুন-২০১৮

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০

টেলিফোন : ৮৮-০২-৭৭৪৫০১০-১৬ পিএবিএক্স
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭৭৪৫০২৯
ওয়েব সাইট : http://www/bpatc.org.bd

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে : **কথা এন্টার প্রাইজ**
১৫১৫ দক্ষিণ দনিয়া, পাটেরবাগ
ঢাকা-১২৩৬

লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

ভাষা অর্জন তত্ত্ব এবং এর গতিপথ ৫

ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান

সিলেট জেলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বর্তমান আর্থ-সামাজকি অবস্থা: একটি সমীক্ষা ৪১

অধ্যাপক ড. আ.ক.ম মাহবুবুজ্জামান

গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ৫৭

ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া

ব্রিটিশ জরিপ কার্যক্রম: ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িকতার মূলসূত্র ৮৫

ড. মো: আসাদুজ্জামান

ভাষা অর্জন তত্ত্ব এবং এর গতিপথ

মোঃ সাহেদুজ্জামান, পিএইচডি*

Abstract

This essay presents an analytical history of the philosophical and scientific inquiry of acquisition of language by the human child. The essay aims to follow the centuries-long continuity of theoretical and empirical investigations—setting off from the ancient Western and Indian thoughts—concerning human language acquisition, and find out its most recent direction. The discussion has made an effort to shed light on the question, namely, whether the opposing ideas of the Nativiss and Empiricist/Behaviorist theories can be combined with regard to language acquisition.

১. ভূমিকা

মানবশিশু বা মানুষ কী প্রক্রিয়ায় ভাষা অর্জন বা আয়ত্ত করে—এই বহু প্রাচীন প্রশ্ন 'ভাষা-অর্জন' নামক জ্ঞানক্ষেত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এ-সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী একাধিক তত্ত্ব তথা মতবাদের অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও ভাষা-অর্জন সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি তত্ত্বের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

ভাষা এবং ভাষা অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান এবং তত্ত্ব প্রণয়নের ইতিহাস সুদীর্ঘ। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য—উভয় ঐতিহ্যেই এই অনুসন্ধানের গভীরতা ও ব্যাপকতা লক্ষণীয়। তবে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জীববিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ এবং গবেষণার পদ্ধতি ও সরঞ্জাম সহযোগে যেভাবে এই জ্ঞানশাখাকে একটি বহুশৃঙ্খলামূলক (multidisciplinary), রৌপ (formal) ও পরীক্ষামূলক (experimental) কাঠামো দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় ঐতিহ্যে তার দৃষ্টান্ত নেই। নিচের অনুচ্ছেদসমূহে ভাষা অর্জন বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতধারাসমূহের বিশদ পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিচিতি সংশ্লিষ্ট জ্ঞানবিশ্বে বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনাটির একটি স্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে এবং একে পথনির্দেশ দেবে।

---

* উপপরিচালক (গবেষণা পরিকল্পনা, সেমিনার ও প্রকাশনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

২. ভাষা অর্জন তত্ত্বসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর সংলাপ *Cratylus*-এ (Plato, 1998) এই প্রশ্নে আলোচনার অবতারণা করেছেন যে, বস্তুর নাম তাদের প্রাকৃতিক (natural) ও সত্যিকার (ture) নাম, নাকি মানুষ-কর্তৃক প্রদত্ত এবং মানুষের মধ্যে প্রচলিত (conventional) নাম মাত্র।

বস্তুর নাম তথা ভাষা স্বভাবজ বা প্রাকৃতিক হলে তা হবে সমরূপ (regular), নিয়মবদ্ধ এবং যৌক্তিক (logical/rational)। অন্যথায় তা হবে অনিয়মিত (irregular) ও স্বেচ্ছাচারী (arbitary)। ভাষা সম্বন্ধে এই দুটি সম্ভাব্য পরস্পর-বিপরীত বাস্তবতার ভিত্তিতে দুটি মতবাদ বা দল গড়ে ওঠে। ভাষার সমরূপতা ও যৌক্তিকতায় বিশ্বাসীদের বলা হতো সাদৃশ্যবাদী (analogists), বিপরীত মতে বিশ্বাসীদের বলা হতো বৈসাদৃশ্যবাদী (anomalists) (Bloomfield, 1935)।

সাদৃশ্যবাদিতাই গ্রিক তথা ইউরোপীয় দার্শনিকদেরকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। ফলে তাঁরা নিজেদের ভাষার সংগঠনকে বিশ্বজনীন বলে ধরে নিয়েছিলেন (Bloomfield, 1935)। গ্রিকদের পরে রোমানরা তাঁদের ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন গ্রিকদেরকে অনুসরণ করেই। মধ্যযুগে রোমানদের ব্যবহৃত ল্যাটিন ভাষা ভেঙে যখন আধুনিক রোমান্স ভাষাগুলি, যেমন—ফরাসি, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ জন্ম নিচ্ছিল তখনও লেখার ভাষা হিসেবে প্রাচীন ল্যাটিনই ব্যবহৃত হতো। পণ্ডিতেরা প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা অধ্যয়ন করে সে-ভাষার নানা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন। তাঁরা সে-ভাষার মধ্যে মানব-ভাষার যৌক্তিক ও প্রাকৃতিক রূপ খুঁজে পান।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৬৬০ সালে ফ্রান্সের পোর্ট-রয়্যাল কনভেন্ট-এর আর্নল্ড আঁতোয়াইন (Arnauld Antoine) রচনা করেন (চূড়ান্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৭৬ সালে) *Grammaire generale et raisonnee* (*General and Rational Grammar*) (Arnauld & Lancelot, Trans. 1975), যা 'পোর্ট-রয়্যাল গ্রামার' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে দেখানো হয় যে, বিভিন্ন ভাষার—বিশেষত ল্যাটিন ভাষার—সংগঠনের মধ্যে রয়েছে এমন যৌক্তিক রূপ যা পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্লেটো তাঁর সংলাপ *Meno*-য় একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন: মানবশিশু কীভাবে অপ্রতুল তথ্য থেকে অল্প সময়ে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করে? এটি তাঁর কাছে ছিল একটি দার্শনিক সমস্যা, যার সমাধানও তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর সমাধান ছিল: মানুষ জ্ঞান নিয়েই জন্মায় (Plato, Trans. 1924)। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদী (Rationalist) দার্শনিকগণ, বিশেষত রেনে দেকার্ত (Descartes, Trans. 1984-85, 1991) ও জি. ডব্লিউ. লাইবনিয্ (Leibniz, Trans. 1949) প্লেটোর মতবাদকে সমর্থন ও সমৃদ্ধ করেছেন। মানুষ কীভাবে ভাষার জ্ঞান অর্জন করে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁরা প্লেটোর মতবাদকেই আশ্রয় করেছিলেন।

অন্যদিকে, প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল বললেন, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই জ্ঞান (ভাষার জ্ঞানও) অর্জনের একমাত্র উপায় (Aristotle, Trans. 1038)। ভাষা প্রসঙ্গে তিনি মানব-মনকে 'শূন্য শ্লেট' (tabula rasa) বলে আখ্যায়িত করলেন (Aristotle, Trans. 1964)। এই ধারণা প্লেটো ও কার্তেসীয় ভাষা-দার্শনিকদের বর্ণিত 'সহজাত জ্ঞান' (innate knowledge)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে-অর্থে, মানব-ভাষা বিষয়ে অ্যারিস্টটলকে একজন প্রচলবাদী ('conventionalist')[১] বলা যায়।

ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক (John Locke) তাঁর *An Essay Concerning Human Understanding* গ্রন্থে tabula rasa-র ধারণাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন[২] । সেখানে তিনি মানব-মনকে 'সাদা কাগজ' (white paper) বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, মানুষের জীবন এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান সেই সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ হয় (Locke, 1960/1975)। মূলত লকই তাঁর এই গ্রন্থের মাধ্যমে 'অভিজ্ঞতাবাদ' (Empiricism) নামক দার্শনিক মতবাদের জন্ম দেন।

আমেরিকান 'আচরণবাদী' (Behaviorist) মনস্তত্ত্ববিদ বি. এফ. স্কিনার (B. F. Skinner)-এর গ্রন্থ *Verbal Behavior* (Skinner, 1957) প্রকারান্তরে অভিজ্ঞতাবাদী মতকেই সমর্থন করে। কারণ, আচরণবাদী দর্শন অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হয় ক্রমাগত অভিজ্ঞতা থেকে (Bussmann, 1996)।

বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাদার্শনিক নোয়াম আভ্রাম চমস্কি *Verbal Behavior* গ্রন্থের কঠোর সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সহজাতবাদী (Innatist) ভাষা-দর্শনের সূত্রপাত ঘটান (Chomsky, 1959)। তিনি দেকার্ত, লাইবনিয্‌ ও পোর্ট-রয়্যাল মতাদর্শের ভাষা-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানকে নাম দেন "কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞান" (Cartesian Linguistics) (Chomsky, 2009)। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই তত্ত্বকে চমস্কি ব্যাপক প্রভাববিস্তারী প্রতিষ্ঠা দান করেন, যে-প্রভাব বর্তমানেও অন্য যে-কোনও তত্ত্বের চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত। প্লেটোর প্রশ্নটিকে চমস্কি নাম দেন 'প্লেটোর সমস্যা' ('Plato's problem')। একে উদ্দীপনার অপ্রতুলতা ('Poverty of Stimulus') অভিধায়ও আখ্যায়িত করা হয়। প্রসঙ্গত, ভাষা-অর্জন সংক্রান্ত

---

[১] Aristotle, unlike Plato, is a commited conventionalist as far as words are concerned. He does not believe in the Platonic doctrine of eternal 'forms' or 'ideas' underlying human thought and speech (Harris and Taylor, 1989, p. 22).

[২] বর্তমানকালে মূলত জন লককেই এই মতবাদের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। লক বিশ্বাস করতেন, মানবশিশু একটি সম্পূর্ণ শূন্য মন তথা মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায়। অভিজ্ঞতা এই শূন্য মনে নিজেকে লিপিবদ্ধ করে। এই প্রযত্ন-সর্বস্ব (nurture-only) মতবাদের একটি আধুনিক রূপভেদ হলো বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান আচরণবাদী মনস্তাত্ত্বিক বি. এফ. স্কিনার-এর মতাদর্শ। তিনি মানবমন তথা মস্তিষ্ককে একটি 'কালো বাক্স' ('black box') হিসেবে বিবেচনা করেন, যা জীবন থেকে *নিয়ন্ত্রণ* (conditioning) ও *প্রবলন* (reinforcement) গ্রহণ করে। এই অবস্থান থেকে বিবেচনা করা হয়, প্রযত্ন (nurture) হলো মানবশিশুর ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জ্ঞানগত বিকাশের জন্য দায়ী—প্রকৃতি (nature—জীববিদ্যা, জিনতত্ত্ব) নয়। বর্তমানে অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে সাধারণভাবে এই অবস্থান গৃহীত যে, প্রকৃতি ও প্রযত্ন অবিভাজ্যরূপে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত। উভয়ই মানবের জীবনব্যাপী বিকাশ সাধনে অবদান রাখে (Matsumoto, 2009 p. 554.)।

সমস্ত মতবাদ শেষ বিচারে 'অভিজ্ঞতাবাদ' (Empiricism) ও 'সহজাতবাদ' (Innatism)—এই দুই পরস্পর-বিরোধী দার্শনিক মতবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। যাই হোক, চমস্কি মানব-মস্তিষ্ককে দেখেন 'প্রকৌষ্ঠিক' (Modular) রূপে, অর্থাৎ, বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদনের জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন আলাদা আলাদা অংশ বা 'প্রকোষ্ঠ' (Module) নির্ধারিত আছে। ভাষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্যও তেমনি মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট এলাকা নিয়োজিত (dedicated)।

উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান জাতীয়তাবাদী রোম্যান্টিক চিন্তাপদ্ধতি এই ধারণার জন্ম দেয় যে, ভাষা হলো জাতির আত্মার প্রকাশ। জার্মান দার্শনিক ভিলহেল্ম ভন হামবোল্ট এই ধারণার সূত্রপাত করেন (Humboldt, 1988)।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক Edward Sapir-এর ছাত্র Benjamin Lee Whorf দেখান, ভাষার জাতিগত পার্থক্য কীভাবে মানবজ্ঞান ও আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে (Whorf, 1956)। একে বলা হয় 'ভাষা-আপেক্ষিকতা' (Linguistic Relativity)। এটি 'সাপির-হোঅর্ফ প্রাকতত্ত্ব' (Sapir Whorf Hypothesis) নামেও পরিচিত। এই প্রাকতত্ত্ব অ্যারিস্টটলের ভাষাচিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভাষা-বিশ্বজনীনতার ধারণার বিপরীত।

১৯৮০-র শেষ ও ১৯৯০-এর প্রথমাংশে 'জ্ঞানমূলক-মনস্তত্ত্ব' (cognitive psychology)-র অগ্রগতির ফলে 'জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞান' (cognitive linguistics) নতুন প্রাণ লাভ করে। জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞান মানুষের ভাষিক ক্ষমতাকে মানব-মস্তিষ্কের সাধারণ জ্ঞান প্রক্রিয়াকরণ হিসেবেই দেখে, যা চমস্কি-কথিত প্রকৌষ্ঠিক (Modular) ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। 'পরিসংখ্যানগত শিখন' (statistical learning) জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞানের একটি অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র। 'জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞান'-এর এই ধারণা নিয়ে আরেকটি মতবাদ—সংযোগবাদ (Connectionism) গড়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় ভাষাচিন্তন ও ভাষা-দর্শন জ্ঞানচর্চার জগতে অনেক বেশি উচ্চকিত হলেও ভারতীয় ভাষাচিন্তনের ইতিহাস ইউরোপের থেকে পুরনো। ভারতীয় ভাষাদর্শন ও ভাষাচর্চার কিছু নমুনা পাওয়া যায় Betty Heimann-এর *Indian and Western Philosophy* (Heimann, 1937) গ্রন্থে। Heimann দেখিয়েছেন, সংস্কৃত ভাষায় "ক্রিয়ামূলের গতিশীল খণ্ডকে" (the dynamic stem of the verbal root) সাধিত শব্দের মধ্যে সহজেই চেনা যায়। যেমন:

√কর্ → করা, করি, উপকার, হিতকরী।

ভারতীয় ভাষার এই বৈশিষ্ট্য এর 'জৈব বিকাশ' (organic development) অনুসন্ধানের রসদ জোগায়। ভারতীয় দর্শনে যেমন সৃষ্টিজগতের সমস্ত উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কে বিশ্বাস করা হয়, তেমনিভাবে একই ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দসমূহের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সন্তানদের সংবেদনশীল শ্রবণেন্দ্রিয় এভাবে প্রকৃতির কণ্ঠস্বর চিনতে পারে এবং প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকেই ভাষাজগতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় (Heimann, 1937) ভারতীয় ভাষাদর্শনের এই ব্যাখ্যায় আবেগের প্রভাব থাকলেও ভারতীয় দর্শনের স্বরূপটি এখানে সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে।

বলাবাহুল্য, এই দর্শন ইউরোপীয় দর্শন থেকে একেবারেই আলাদা। Heimann তাঁর গ্রন্থে দুটি তুলনামূলক উদ্ধৃতির মাধ্যমে দুই সংস্কৃতির ভাষাদর্শনের পার্থক্যের আভাস দিয়েছেন—

> The Motto of the West:
>
> Man is the measure of all things.
> [Protagoras, c. 500 B.C.]
>
> The Motto of India:
>
> This Atman (the vital essence in Man) is the same in the ant, the same in the gnat, the same in the elephant, the same in these three worlds… the same in the whole universe.
>
> [Brihadaranyaka-upanisad 1,3,22,c,1000 B.C.] (Heimann, 1937)

দৃষ্টিকোণ যা-ই হোক, এ-কথা ভুললে চলবে না যে শেষ পর্যন্ত ভাষা-অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান বস্তুতই একটি বহুশৃঙ্খলামূলক (multidisciplinary) কর্মকান্ড। কারণ ভাষা অর্জনের সাথে মানব-মস্তিষ্কের তথা মানবদেহের বিবর্তনের ইতিহাস ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যাবলি, মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য, মানব-মনস্তত্ত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত; নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে এর সমর্থন আছে—

> That is, we must scrutinize syntactic theory not simply as a theory which accounts for the syntactic data, but as a theory which is, at once, consistent with the syntactic data with the evidence from other fields (whether that be psychology, biology or sociology). (Parker, 2006)

৩. ভাষা অর্জন তত্ত্বসমূহের বিস্তৃততর পরিচয়

৩.১ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা: পাণিনি, পতঞ্জলি ও অন্যান্য

ভাষা কীভাবে মানুষের আয়ত্ত হয়, সে-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা দ্বিধাবিভক্ত ছিল বলে মনে হয়। বস্তুত ভাষাবিজ্ঞান, যাকে প্রাচীন ভারতীয়গণ নাম দিয়েছিলেন ব্যাকরণ, ছিল ধর্মগ্রন্থ বেদ-এর একটি অঙ্গ, অর্থাৎ বেদাঙ্গ, এবং ভাষাচর্চার মূল প্রণোদনা ছিল ধর্মীয় (Matilal, 2001, p. 11)। পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে ভাষা সম্বন্ধে এমনও বলেছিলেন যে, ভাষা হলো মরণশীল মানুষের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এক দেবতা (Matilal, 2001)। তিনি ভাষাকে মানবজাতির সারাৎসার (essence of mankind) হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। দুই হাজার বছর পর এক আধুনিক আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিকগণের অনুসরণে মানবভাষা সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি করেন (Chomsky, 1972)। পতঞ্জলির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্লেটো, কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞান এবং উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির এই সাদৃশ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে, পতঞ্জলির ভাষ্যেই খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর ভারতীয় ব্যাকরণবিদ পাণিনির ভাষা সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়। পতঞ্জলি বলেন, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী রচনার কারণ ছিল সমাজতাত্ত্বিক। ব্যাকরণ শিক্ষায় অনুৎসাহী তরুণ শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ ভাষা শিক্ষায় সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য পাণিনি ব্যাকরণ

রচনা করেন একটি শাস্ত্র হিসেবে (Matilal, 2001, p. 11)। এই মন্তব্যের তাৎপর্য হলো, পাণিনি ব্যাকরণকে দেখতেন প্রকাশ্য (explicit) সংশ্রয় হিসেবে—পতঞ্জলি এবং পাশ্চাত্য কার্তেসীয় ও উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানীদের মতো অন্তর্গত কিংবা অপ্রকাশ্য (implicit) রূপে নয়। অর্থাৎ, পাণিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকাশ্য ব্যাকরণ তথা অভিজ্ঞতা ভাষা শিক্ষায় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। একথা বলা যায় যে, ব্যাকরণ তথা ভাষা সম্পর্কে এই দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুত দুইটি পরস্পর-বিপরীত ভাষা-দর্শন সহজাতবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভাষা অর্জন মূলত অভিজ্ঞতা-নির্ভর—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-চিন্তকগণ শব্দের অর্থ শেখার ৮টি উপায়ের কথা বলেছেন। বিশ্বনাথের *সিদ্ধান্তমুক্তাবলি* বা *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলিতে* (Viśvanātha, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) বর্ণিত একটি নামহীন কিন্তু বহুল-পরিচিত শ্লোকে এই ৮টি উপায়ের কথা বলা আছে। ভাষা অর্জনের এই উপায়গুলি নিম্নরূপ—

১. ব্যাকরণ: পাণিনির ব্যাকরণগ্রন্থের পূর্ণ নাম *অষ্টাধ্যায়ী: শব্দানুশাসন*। সকল যৌগিক শব্দের মূল (root) এবং প্রত্যয় (suffix), সেগুলির সংযুক্তির সূত্রাবলি এবং সেগুলির অর্থ ব্যাকরণে বর্ণিত থাকে। তাই ব্যাকরণ হলো শব্দের অর্থ অনুধাবন এবং শব্দের গঠন শেখার অন্যতম উপায়।

২. সাদৃশ্য: ক-ব্যক্তিটি খ-এর কাছে খ-এর অজানা একটি বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার সময় পরিচিত কোনও বস্তুর সাথে সেটির মিল (বা অমিল) বর্ণনা করে। বস্তুটিকে বাস্তবে দেখে খ তার চেনা বস্তুর সাদৃশ্যে কিংবা বৈসাদৃশ্যে নতুন বস্তুটিকে চিনে নিতে পারে।

৩. শব্দকোষ: সুস্পষ্টভাবেই, এটি শব্দের অর্থ শেখার একটি বৃহৎ উৎস।

৪. নির্ভরযোগ্য কোনও ব্যক্তির উক্তি: বক্তার (বাবা-মা কিংবা সে-রকম কেউ) উক্তি ও অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে তার নির্দেশিত বস্তুটি দেখে শিশু বস্তুটির সঙ্গে উক্ত কথাটির সংযোগ ঘটিয়ে সেটির অর্থ বুঝে নিতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, চতুর্থ-পঞ্চম শতকের খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সন্ত অগাস্টিনও তাঁর *Confessions* গ্রন্থে এ-উপায়ের কথাই বলেছেন।

৫. বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের ভাষিক আচরণ: নাগেশ (Nāgeśa, 1925, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত), প্রভাকর (Prabhākara, 1932, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) এবং গঙ্গেশ (Gaṅgeśa, 1892-1901, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) এটিকেই ভাষা অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেছেন। শুধু শব্দের অর্থ নয়—বক্তার উদ্দেশ্য, ভাব ইত্যাদি তার উক্তি এবং অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে কোনও কর্ম, বস্তু কিংবা ভাবের অনুধাবন বা অর্থ আহরণ ঘটায়। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা শিশুকে কোনও নির্দেশ দিলে শিশুর প্রতিক্রিয়ায় নির্দেশদাতার অনুমোদন কিংবা অননুমোদনে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত ভাষা অর্জনের উপায়ের একই ব্যাখ্যা আমেরিকান আচরণবাদী মনস্তত্ত্ববিদগণ দিয়েছেন।

৬. বৃহত্তর রচনাংশ: কোনও বাক্যের কিংবা অনুচ্ছেদের কোনও শব্দের অর্থ অস্পষ্ট কিংবা শব্দটিকে আপাতত দ্ব্যর্থক মনে হলে, সম্পূর্ণ বাক্যটি কিংবা অনুচ্ছেদটি পড়লে শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়।

৭. ব্যাখ্যা: শিশু কিংবা শিক্ষার্থী কোনও শব্দের অর্থ বিজ্ঞ কারও নিকট থেকে জেনে নিতে পারে, কিংবা শব্দটির ব্যাখ্যা পেতে পারে। বাস্তব জীবনেও শিশুদেরকে প্রায়শই বয়স্কদের কাছে নানা শব্দের ব্যাখ্যা কিংবা অর্থ জানতে চাইতে দেখা যায়।

৮. পরিচিত শব্দের সাথে বাক্যিক সম্পর্ক: "আম্রশাখায় পিক মধুর স্বরে গান গাইছে"—বাক্যটিতে পিক একটি অজানা শব্দ, এবং "মধুর স্বরে গান গাইছে" অংশটি থেকে শ্রোতা আন্দাজ করে নিতে পারে যে, পিক শব্দটির অর্থ কোকিল (Matilal, 2001, p. 15)।

এটা স্পষ্ট যে, উপরে বর্ণিত ভাষা অর্জনের আটটি উপায়ের প্রায় সবগুলিতেই শব্দের অর্থ শেখার তথা অনুধাবনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ভাষাচিন্তারই পরবর্তী পর্যায়ে এই বিষয়ে একটি বিতর্কের জন্ম হয় যে, বাক্যের অনুধাবন বাক্যের শব্দাবলির পৃথক পৃথক অনুধাবনের সমন্বয়ে ঘটে, নাকি একটি সমগ্র একক হিসেবে ঘটে। এই দুটি বিপরীত মতধারা প্রাচীন ভারতীয় ভাষাদর্শনে 'স্ফোট' ও 'মীমাংসা' তত্ত্ব নামে পরিচিত। ভাষা অর্জনের ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হলে এই বিতর্কের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

৩.১.১ স্ফোট তত্ত্ব

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষা-দার্শনিক ভাষার একটি ধারণাগত (Conceptual) রূপের কথা বলেছেন এবং তাকে বিভিন্ন অভিধায় প্রকাশ করেছেন। এ-স্থানে ভাষার এই ধারণাগত রূপটি সম্বন্ধে ভারতীয় মত অনুসন্ধান করা যায়। ভাষা অর্জন সম্বন্ধে ভারতীয় মতধারা অনুধাবনে এই অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার ধারণাগত রূপটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্ফোট' (*sphoṭa*) :

> A simple meaning-bearing symbol, which may be a word or a sentence, is what is called a *sphoṭa*. ...The contrast of the *sphoṭa* is with what may be called the articulated, audible sounds, the 'noisy' realities, are regarded in this theory as the means by which the symbol, the relevant *sphoṭa*, is revealed or made public. (Matilal , 2001, p. 77)

পরে আমরা দেখব, ভাষার এই দ্বি-রূপের ভারতীয় ধারণাকে পাশ্চাত্য সাংগঠনিক ও উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের যথাক্রমে *langue* ও *parole* (Saussure, Trans. 1959, pp. 9, 13) এবং *competence* ও *performance* (Chomsky, 1965)-এর ধারণার সঙ্গে সহজেই মেলানো যায়। পতঞ্জলি স্ফোট-কেই ভাষা বলেন, আর এর ধ্বনিগত প্রকাশকে বলেন ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য (Patanjali, 1892)। তাঁর মতে, ভাষার প্রকাশ তথা ধ্বনির প্রকাশ হতে পারে বিভিন্ন—কোমল কিংবা তীক্ষ্ণ, হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ; কিন্তু ভাষা (*śabda*)[৩] অপরিবর্তনীয়, ব্যক্তি-ভাষাভাষীর নিজস্বতা সেটিকে প্রভাবিত করে না (Matilal, 2001, p. 79)।

স্ফোট-তত্ত্ব মূলত যাঁর নামের সঙ্গে জড়িত হয়েছে, তিনি হলেন সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় কবি ও ব্যাকরণবিদ ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরি তাঁর *বাক্যপদীয়* (Bhartṛhari, 1965, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) গ্রন্থে স্ফোট-তত্ত্বের বিস্তার ঘটিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি 'পদ-স্ফোট' এবং 'বাক্য-স্ফোট'-এর কথা বলেছেন। ভর্তৃহরির তত্ত্বের সবচেয়ে বিশিষ্ট ও লক্ষণীয় দিক হলো—তিনি 'পদ-স্ফোট' এবং 'বাক্য-স্ফোট'কে অর্থ বহনকারী একক ('meaning-bearing unit') হিসেবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, স্ফোট-ই হলো যথার্থ ভাষিক একক, যা এর অর্থের সাথে অভিন্ন। ভাষা অর্থ কিংবা চিন্তার বাহন নয়; চিন্তা ও ভাষা পরস্পরকে অবলম্বন করে থাকে। মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়াকে তিনি বলেন 'শব্দনা' (*Śabdanā*—'languageing')। সুতরাং, ভর্তৃহরির দৃষ্টিতে ভাষিক একক এবং এর অর্থের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই (Matilal, 2001, p. 85)। অনেক পরের একজন প্রধান ইউরোপীয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিন্যান্দ দ্য সস্যুরও ভর্তৃহরির মতো ভাষা ও চিন্তার অভেদত্বে বিশ্বাস করতেন (Saussure, Trans. 1959)।

পতঞ্জলি-কথিত অপরিবর্তনীয় 'স্ফোট' আদর্শায়িত (idealized) ভাষা তথা বাক্যের ধারণা দেয়। আবার ভর্তৃহরি বাক্য ও এর অর্থকে দেখেন একটি অবিভাজ্য একক (স্ফোট) হিসেবে। তাঁর মতে, বাক্যকে আমরা বিভক্ত করি দুটি কারণে।

এক. ভাষা শিখন ও অনুধাবনের প্রয়োজনে, দুই. ব্যবহারের প্রয়োজনে। কিন্তু বাক্য প্রকৃতপক্ষে অবিভাজ্যই থেকে যায়। এই অবিভাজ্য বাক্য বক্তা-শ্রোতার অভ্যন্তরে থাকে, যা বিভাজিতরূপে বচন বা নাদ (*nāda*—speech) আকারে প্রকাশিত হয় তার ভাষা ব্যবহারে (Matilal, 2001, p. 97)।

৩.১.২ *'মীমাংসা'তত্ত্ব*

স্ফোট-তত্ত্ব মীমাংসাবাদীদের (*Mīmāŋsakas*) বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে। মীমাংসা-তত্ত্বে কোনও ধারণাগত এবং অভ্যন্তরীণ স্ফোট-এর অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে, ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশিত রূপের বাইরে ভাষার আর-কোনও অন্তর্গত রূপ নেই (Śabara, 1929, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত)। অন্যতম মীমাংসক কুমারিলাভট্ট উদাহরণ সহযোগে যুক্তি দেখান যে, 'গাভী' শব্দটি যদি একটি একক, অবিভাজ্য, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (entity) তথা স্ফোট হয়, তাহলে কোনও ধ্বনি কিংবা বর্ণের সাহায্য ছাড়াই এটি অনুধাবন (perceive) করা সম্ভব হতো। কিন্তু বাস্তবে, এটি কতকগুলো ধ্বনি কিংবা বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রকাশিত একটি কাঠামো, এবং ঐ ধ্বনি কিংবা বর্ণের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে এটির অনুধাবন সম্ভব নয়। কুমারিলা বলেন যে, শব্দ বা বাক্য স্থানে (spatially) ও কালে (temporally) বিস্তৃত এককেকটি উপাদানক্রম (sequence) (Kumārilabhaṭṭa, 1898, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত)।

---

[৩]প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় *শব্দ* (*śabda*) বলতেও ভাষাকেই বোঝায়। পাণিনির গ্রন্থ *অষ্টাধ্যায়ী : শব্দানুশাসন*-এ 'শব্দ' অভিধাটি ভাষা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরির স্ফোট তত্ত্বে বাক্যকে যে-অবিভাজ্য আর্থ-গাঠনিক (কারণ, স্ফোট-তত্ত্বে বাক্যের গঠন ও অর্থ অবিভাজ্য) একক হিসেবে দেখা হয়েছে, মীমাংসা-তত্ত্বে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। মীমাংসকগণের মতে, ক্ষুদ্রতম আর্থ একক হিসেবে বাক্যকে গ্রহণ করা অর্থহীন। কারণ বাক্যের সংখ্যা অসীম, এবং কোনও ভাষার প্রতিটি বাক্য ও সেগুলির অর্থ আলাদাভাবে শিখে সেই ভাষা শেখা সম্ভব নয়।

তবে ভাষা তথা বাক্য অনুধাবনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মীমাংসকগণের মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের অস্তিত্ব রয়েছে, যে-বিরোধ ভাষা অর্জন তত্ত্বের বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ। মীমাংসক ভট্ট (Kumārila, *c.* AD 650/1898, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) এবং প্রভাকর (Prabhākara *c.* AD 670/1932, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) উভয়ই বাক্যকে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত (composite) বিভাজ্য কাঠামো হিসেবে দেখলেও বাক্যের অনুধাবনের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ভট্ট বলেন যে, বাক্যের প্রতিটি শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ অনুধাবন করার পরই আমরা সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ অনুধাবন করতে পারি। অন্যদিকে, প্রভাকর মত দেন যে, বাক্যের অর্থ আমরা গ্রহণ করি ঐ বাক্যের শব্দসমূহের সংযুক্ত অর্থ হিসেবে—একটি সমগ্র একক রূপে। কারণ, বাক্যে কোনও শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ থাকতে পারে না। বাক্যের মধ্যে গ্রথিত অবস্থায় শব্দসমূহের যে-অর্থ, তা-ই ঐ সব শব্দের অর্থ। সুতরাং, প্রভাকরের বিচারে বাক্যের অনুধাবন একটি একক (unitary) ক্রিয়া, এবং সমগ্র বাক্য বিচারে বাগার্থিক পূর্ণতা লাভ ঘটে।

প্রভাকর এবং ভর্তৃহরির বিপরীতে ভট্ট তাঁর যুক্তি বিস্তার করেছেন। মতিলাল (Matilal, 2001, pp. 109-110) ভট্টের পক্ষে সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি যুক্তি তুলে ধরেছেন, যেখানে ভাষার 'সৃষ্টিশীলতা'র একটি ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। নিচের চারটি বাক্য বিবেচনা করা যাক :

১. গাভী আনো। ২. ঘোড়া আনো। ৩. গাভী বাঁধো। ৪. ঘোড়া বাঁধো। ভট্টের মতে, শিশু বাক্যগুলিকে চারটি বাক্য হিসেবে না শিখে প্রথমে শব্দগুলি এবং সেগুলির অর্থ শিখবে। এখন প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে 'কালো' শব্দটি জুড়ে দিলে দেখা যাবে, পাঁচটি শব্দ (গাভী, ঘোড়া, আনো, বাঁধো, কালো) মোট আটটি বাক্যের গঠনের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। উপর্যুক্ত চারটি বাক্য ছাড়া তখন আরও চারটি বাক্য পাওয়া যাবে—

৫. কালো গাভী আনো। ৬. কালো ঘোড়া আনো। ৭. কালো গাভী বাঁধো। ৮. কালো ঘোড়া বাঁধো।

এভাবে নতুন নতুন শব্দযোগে এমন বাক্যরাজি গঠনের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, যে-সকল বাক্য পূর্বে শোনা যায়নি। এভাবে শব্দ শিখে এবং বাক্যে সেগুলির বিন্যাস (*ākāṃkṣā*—syntactic pattern) সাধন করে একেকটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করা যায়। উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানও বাক্য গঠনের অনুরূপ প্রক্রিয়ার পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে।

৩.২ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের চিন্তা: প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

৩.২.১ প্লেটোর মতবাদ: সহজাতবাদের উৎস

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি, ভারতীয় ভাষাচিন্তার পরস্পর-বিরোধী ধারা—'স্ফোট' ও

'মীমাংসা' তত্ত্ব—ভাষা অর্জনের দুটি বিপরীত প্রক্রিয়ার আভাস দেয়। একটি ধারায় ভাষা মানুষের অভ্যন্তরে ধারণাগত রূপে থাকে (স্ফোট-তত্ত্ব), অন্য ধারায় ভাষা একান্তই বহিস্থ একটি অস্তিত্ব (মীমাংসা-তত্ত্ব), এবং মানুষ ভাষা অর্জন করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ভাষা অর্জনের তত্ত্ব অনুসন্ধানে পাশ্চাত্যে অনুরূপ দুটি পরস্পর-বিপরীত ধারার জন্ম হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক চিন্তা থেকেই এই বিভক্তির সূত্রপাত ঘটেছে।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর *Cratylus* (Plato, Trans. 1998) গ্রন্থে বস্তুর নামের প্রকৃতি ও উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্লেটোর উক্ত সংলাপটির জিজ্ঞাস্য ছিল: বস্তুর নামের কোনও প্রাকৃতিক উৎস আছে কি না? নাকি ঐ সব নাম ভাষিক সমাজ-কর্তৃক স্বেচ্ছাচারীভাবে প্রদত্ত প্রচল মাত্র? প্লেটো প্রচল-তত্ত্বের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন, এবং 'সত্য' (truth)-কে সামাজিক মতৈক্যের ওপর স্থান দিয়েছেন (Harris & Taylor, 1989)। ভাষার স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিন্যান্দ দ্য সস্যুর (Saussure, Trans. 1959)।

বিভিন্ন সময়ে বেশকিছু পরীক্ষা ভাষার স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির স্বরূপ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে (Holland & Wertheimer, 1964, Kovic, Plunkett & Westermann, 2010-এ উদ্ধৃত; Köhler, 1947; Ramachandran & Hubard, 2001; Wertheimer, 1958; Sapir, 1929; Kunihira, 1971; Brown, Black, & Horowitz, 1955; Gebels, 1969; Brackbill & Little, 1957; Brown et al., 1955)।

এইসব পরীক্ষা সাধারণভাবে নির্দেশ করে যে, নামের (label) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের (phonological property) সঙ্গে উক্ত নাম-নির্দেশিত বস্তুর (referent) অনুধাবনগত বৈশিষ্ট্যের (perceptual property) একটি 'স্বভাবজ সংযোগ' ('naturally-biased mapping') আছে (Maurer et al., 2006, Kovic, Plunkett & Westermann, 2010-এ উদ্ধৃত)। তবে এই ফলাফল ভাষার প্লেটো-কথিত প্রাকৃতিক উৎসকে সপ্রমাণ করে না। কারণ, উদ্ধৃত পরীক্ষাসমূহ বস্তুত ভাষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে কাজ করেছে। অন্যদিকে, প্লেটোর 'রূপ' ('forms') ও 'ধারণা' ('ideas')-বিষয়ক তত্ত্বে পার্থিব সত্য হলো 'পরম সত্য' (absolute reality)-এর ছায়া বা প্রতিফলন মাত্র, আর ভাষা হলো এই দুই জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম (Cornford, 1935)। প্লেটোর এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বাইরে অবস্থান করে।

প্লেটোর 'পরম সত্য' মতবাদ ভাষা অর্জন সম্বন্ধে তাঁর মত গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বস্তুত *Meno* গ্রন্থে প্লেটো বলেন যে, যে-কোনও জ্ঞান হলো বিভিন্ন জন্মে অবিনশ্বর আত্মা-কর্তৃক অর্জিত। তাই কোনও কিছু শেখার অর্থ হলো সর্বজ্ঞানী আত্মার স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করা। প্লেটোর মতে, এ-কারণেই গণিতের জ্ঞানও মানুষকে অর্জন করতে হয় না, কেননা পূর্বজন্মে অর্জিত ঐ জ্ঞান মানুষ স্মরণ করে মাত্র। আর এই স্মরণ করার জন্য কিছু প্রশ্ন করাই যথেষ্ট (Plato, Trans. 1924)। অল্প সময়ে অপ্রতুল তথ্য থেকে মানবশিশুর সম্পূর্ণ জ্ঞান (ভাষার জ্ঞানও) অর্জনের উত্তর প্লেটো এভাবেই দিয়েছেন।

৩.২.১ *অ্যারিস্টটলের মতবাদ: অভিজ্ঞতাবাদের উৎস*

প্লেটোর ছাত্র অ্যারিস্টটল ভাষা বিষয়ে গুরুর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ভাষা অধ্যয়নে অ্যারিস্টটলের অবদান বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপে, যা ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গিরও আভাস দেয়—

> His first great contribution to the study of language—not often mentioned—is the fact that he demythologized language. Rather than seeing language as a magical instrument to cast spells, entrance people, and call up past, present, and future spirits, he saw language as an object of rational inquiry, a means of expressing and communicating thoughts about anything in the world. (Seuren, 2006, p. 555)

বস্তুত ভাষা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের অবস্থান সত্য (truth) সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকোণেরই প্রতিফলন, যা প্লেটোর 'পরম সত্য'-এর ধারণার বিপরীত। অ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 'পরম সত্য' বলে কিছু নেই। তিনি তাঁর *On the Soul* (Aristotle, Trans. 1964) গ্রন্থে আত্মাকে 'শূন্য শ্লেট' (*tabula rasa*) বলে বর্ণনা করেন এবং 'অভিজ্ঞতাবাদ' নামে পরবর্তীকালে-বিকশিত দার্শনিক মতধারার বীজ বপন করেন, যে-মতবাদ অনুযায়ী মানুষ কোনও জ্ঞান (এবং ভাষার জ্ঞানও) নিয়ে জন্মায় না, জন্মায় একটি শূন্য মন নিয়ে। মানুষ ভাষা অর্জন করে অভিজ্ঞতা তথা শিখন থেকে। বলা যায়, বস্তুত, ভাষা অর্জন সংক্রান্ত সকল তত্ত্ব শেষ বিচারে প্লেটোর দর্শনজাত সহজাতবাদ (Innatism), এবং তাঁরই ছাত্র অ্যারিস্টটলের দর্শনজাত অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)-এর আওতায় পড়ে।

৩.৩ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিকগণ

৩.৩.১ *বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ: দেকার্ত ও লাইবনিয্*

প্লেটোর দর্শনকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদী (Rationalist) দার্শনিকগণ ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ অ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতধারা অবলম্বন করেন। বুদ্ধিবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে, মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয় না; সকল জ্ঞানই মানুষের অভিজ্ঞতা-পূর্ববর্তী। ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত সপ্তদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদী দর্শনের মূল প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর *Discourse on the Method*, *Meditations on First Philisophy*, *Correspondence* (Descartes, Trans. 1984-85/1991-এ সংকলিত) গ্রন্থসমূহে ভাষা এবং ভাষা অর্জন বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দেকার্ত মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর মূলগত পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে মানবেতর প্রাণীকে নিছক যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন এবং তার বিপরীতে মানুষকে একটি যৌক্তিক (rational), সৃষ্টিশীল, চেতনাসম্পন্ন (conscious) প্রাণী হিসেবে বর্ণনা করেন। ভাষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দার্শনিক অবস্থানের অনুগামী। মানুষের ভাষা, দেকার্তের দৃষ্টিতে, যৌক্তিক তথা নিয়ম-ভিত্তিক (rule-based) এবং সেই কারণে সৃষ্টিশীল। একই সঙ্গে

তা চেতনাসম্পন্ন ও পরিবেশ-নিরপেক্ষ (context-independent)। এই ভাষা-দর্শনকেই নোয়াম চমস্কি 'কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞান' আখ্যা দিয়ে 'উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞান'-এর ভিত্তি হিসেবে সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন (Chomsky, 2009)।

সপ্তদশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী দর্শনের আরেক প্রধান ব্যক্তিত্ব জার্মান দার্শনিক গটফ্রিড উইলহেল্ম লাইবনিয্, যিনি সমকালীন এবং পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষা-দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। লাইবনিয্ মনে করেন যে, একটি মর্মরখণ্ডের মধ্যে যেমন কোনও মূর্তি খোদিত হবার সম্ভাবনা অন্তর্লীন থাকে, তেমনি করে অন্তর্গত ধারণা বা জ্ঞান আমাদের মধ্যে অস্তিত্বশীল। লাইবনিয্-এর মতে—

> ...if the soul resembles these blank tablets, truth would be in us as the figure of Hercules is in the marble, when the marble is wholly indifferent to the reception of this figure or some other. But if there were veins in the block which would indicate the figure of Hercules rather than other figures, this block would be more determined thereto, and Hercules would be in it... (Leibniz, Trans. 1949, pp. 45-46)

অন্তর্গত তথা সহজাত ধারণা বা জ্ঞানের (innate ideas) অস্তিত্ব সম্বন্ধে লাইবনিয্-এর মত অভিজ্ঞতাবাদের সাথে বেশি সাংঘর্ষিক। লাইবনিয্ যে-সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছেন, তা ভাষা অর্জনের একটি একীভূত (unified) তত্ত্ব নির্মাণে মূল ভূমিকা পালন করতে পারত।

৩.৩.২ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ: লক ও হিউম

অভিজ্ঞতাবাদী ইংরেজ দার্শনিক জন লক, ডেভিড হিউম প্রমুখ অ্যারিস্টটলের অনুসরণে বলেন যে, ধারণা (concept/idea) মানুষের মনে উদ্ভূত হয় ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি (percept) কিংবা প্রতিচ্ছায়ার (impression) মাধ্যমে (Locke, 1975; Hume, 1978)। অন্য কথায়, প্রত্যক্ষ এবং মূর্ত অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের (এবং ভাষার জ্ঞানের) একমাত্র উৎস।

অন্য সকল দার্শনিক মতবাদের মতো অভিজ্ঞতাবাদেও ভাষা অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধানের উদ্যোগ আছে। অভিজ্ঞতাবাদীগণ অন্তর্গত কিংবা সহজাত ধারণায় বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন যে, মানুষের সাধারণ ধারণা প্রক্রিয়াকরণ কিংবা শিখন প্রক্রিয়ার—যেমন, 'নকশা শনাক্তকরণ' (pattern recognition)[৪], 'সংযোগ' (association)[৫] কিংবা 'নিয়ন্ত্রণ' (conditioning)[৬]-এর মাধ্যমেই মানুষ ভাষা অর্জন করে। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক অথবা মনে ভাষার জন্য পৃথক কোনও স্থান বা ব্যবস্থার কথা অভিজ্ঞতাবাদীরা স্বীকার করেন না। একই অবস্থান গ্রহণ করেন

---

[৪] জীবের মধ্যে ক্রিয়াশীল উদ্দীপকের নকশা শনাক্ত করার এবং একটি উদ্দীপকের নকশা থেকে অন্য একটি দ্দীপকের নকশা পৃথকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা।

[৫] উদ্দীপক ও সাড়া-র মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

[৬]আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত একটি শিখন-প্রক্রিয়া। *নিয়ন্ত্রণ* বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট কোনও উদ্দীপকের সাথে সংযোগের পর নির্দিষ্ট কোনও ক্রিয়ার হ্রাস বা বৃদ্ধি। (Matsumoto, 2009)

আচরণবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণ এবং এই অবস্থানের বিরুদ্ধে জোরালো মত পোষণ করেন আধুনিক উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানীগণ। বিশেষ করে চমস্কির মতো বুদ্ধিবাদী ভাষা-দার্শনিক এবং তাঁর অনুসারীগণ দেখাতে চান যে, মস্তিষ্কের বিশেষ প্রকোষ্ঠ (module) প্রাকৃতিকভাবেই ভাষার জন্য নির্দিষ্ট এবং এই অংশের নিজস্ব কর্মপ্রক্রিয়া রয়েছে। বস্তুত, অভিজ্ঞতাবাদের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং বুদ্ধিবাদ তথা সহজাতবাদের সংযোগে সে-সব সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব।

৩.৪ ফরাসি 'পোর্ট-রয়্যাল' ও কার্তেসীয় ব্যাকরণ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি পোর্ট-রয়্যাল 'কনভেন্ট'-এ বিশেষ এক শিক্ষণ-পদ্ধতির অনুসরণ শুরু হয়। এই শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করেছিল 'the goal of devising new, less painful methods of learning a language' (Tsiapera and Wheeler, 1993, p. 109)। কারণ, এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তক মনে করেছিলেন যে, সবসময় সহজতম কাজটি থেকে আরম্ভ করাই শ্রেয়, এবং যা পরিচিত তা-ই অপরিচিতের ওপর আলো ফেলতে পারে। তাই মাতৃভাষাই নতুন ভাষা শিক্ষা করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। বিশেষ করে অপরিণতমস্তিষ্ক শিশুদের জন্য এ-কথা অনেক বেশি প্রযোজ্য (Arnauld & Lancelot, Trans. 1975)। নতুন পদ্ধতিতে প্রথমে ফরাসি ভাষায় ল্যাটিনের বিষয়গুলি পড়ে তারপর মূল ল্যাটিনে প্রবেশ ঘটত। এতে ভাষা শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে।

মাতৃভাষায় ল্যাটিন ভাষা শিক্ষাদান করা পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ-এর অব্যবহিত লক্ষ্য ছিল। তবে, এই ব্যাকরণের গভীর প্রভাব সমকালীন এবং পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানের ওপর পড়ে। নতুন ভাষাশিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলার পিছনে পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ-এর রচয়িতাগণ যে-চিন্তাকে ভিত্তি করেছিলেন তা হলো সকল ভাষার অন্তর্গত সাধারণ উপাদান বা বৈশিষ্টাবলি (features), যে-সব উপাদান বা বৈশিষ্ট্যকে পরে 'ভাষা-বিশ্বজনীন' (language universal) অভিধা দেওয়া হয়েছে। ভাষায় বিশ্বজনীন উপাদানের উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপ যৌক্তিক কাঠামোর সাহায্যে—

> From a strictly logical point of view, it is possible to define universals as any statements about language which include all languages in their scope, technically all statements of the form "$(x)x\varepsilon L \supset \ldots$," that is, "For all x, if x is a language, then...". (Greenberg, 1963)

ব্যাকরণ সম্বন্ধে পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ-এর ব্যাখ্যা প্রাথমিকভাবে সাধারণ ধারণার থেকে খুব ভিন্ন নয়। এই চিন্তাধারায় ব্যাকরণ হলো 'বাচনের শিল্প' (art of speaking)। ভাষা তথা কথা হলো কিছু চিহ্নের সাহায্যে নিজের চিন্তাকে ব্যাখ্যা করা, যে-সব চিহ্ন মানুষ সেই উদ্দেশ্যেই উদ্ভাবন করেছে। ব্যাকরণের কাজ হলো ঐ সব চিহ্নের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য, এবং যে-প্রক্রিয়ায় মানুষ তাদের চিন্তাকে অর্থ দেবার জন্য ঐ চিহ্নগুলিকে ব্যবহার করে, তা সন্ধান করা (Arnauld & Lancelot, Trans. 1975, p. 41)।

আমরা দেখেছি যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় ব্যাকরণবিদ পাণিনিও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তবে পাণিনির উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পদ্ধতি এবং পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক গুণগত পার্থক্য লক্ষণীয়। পাণিনি শুধু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের জন্য সংস্কৃত ভাষাতেই ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ রচয়িতাদের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাধারা ছিল বিশ্বজনীন। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি সকল মানবভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। বস্তুত পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের বিশেষ গুরুত্ব ভাষা-বিশ্বজনীন-এর ধারণাকে রূপ দেওয়ার মধ্যে নিহিত[৭]।

অবশ্য এ-কথা স্মর্তব্য যে, ভাষা-বিশ্বজনীনের ধারণা শুধু পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণই ধারণ করে না—সার্বিকভাবে কার্তেসীয় এবং বুদ্ধিবাদী দর্শন তথা ভাষাচিন্তা সাধারণভাবে, এবং বিশেষভাবে, এই অবস্থান গ্রহণ করে।

চমস্কি কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞান তথা উৎপাদনী ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন (Chomsky, 2009)। কার্যত, পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের ব্যাখ্যা চমস্কি-কথিত 'বিশ্বজনীন ব্যাকরণ' (UG) এবং ভাষার 'গভীরতল সংগঠন' (Deep Structure) ও 'উপরিতল সংগঠন' (Surface Structure)-এর ধারণায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক তত্ত্বগত ভিত্তি দান করেছিল[৮]।

চমস্কি তাঁর কথিত 'গভীরতল সংগঠন'-এর সপক্ষে পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভাষার একটি অন্তর্গত এবং একটি বহির্গত দিক রয়েছে। একটি বাক্যকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়: এক. এটি কীভাবে চিন্তা বা রূপের প্রকাশ ঘটায়, দুই. এটির ভৌত আকৃতি। অর্থাৎ, প্রথমটি হলো বাক্যটির আর্থ ব্যাখ্যা ('semantic interpretation'), দ্বিতীয়টি হলো বাক্যটির ধ্বনিবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ('phonetic interpretation')। চমস্কি, তাঁর ভাষায়, 'সাম্প্রতিক পরিভাষা' ('recent terminology') ব্যবহার করে প্রথমটিকে বলেন বাক্যের 'গভীরতল সংগঠন' ('Deep structure')। এটি হলো

---

[৭] If it was the aim of the Port-Royal Grammars of particular languages to make the learning of each of those individual languages easier, the aim of the *General and Rational Grammar* (hereafter referred to simply as the *Grammar*) appears to have been to make the learning of any (and all) language(s) easier. (We might thus concieve of it as something like a 'master's guide' for the teaching of languages.) For the *Grammar* is an inquiry into the foundations of the art of speaking, providing an account of the nature of language. In this respect it is a 'general' (or 'universal') grammar : it is an explanation of the grammatical fitures shared by all languages. (Harris & Taylor, 1989, p. 97).

[৮] ...the study of the creative aspect of language use develpos from the assumption that linguistic and mental processes are virtually identical, language providing the primary means for free expression of thought and feeling, as well as for the functioning of the creative imagination. Similarly, much of the subtantive discussion of grammar, throughout the development of what we have been calling "Cartesian linguistics," derives from this assumption. The Port-Royal *Grammar*, for example, begins the discussion of syntax with the observation that there are "three operations of our minds: *conceiving*, *judging*, and *reasoning*".... From the manner in which concepts are combined in judgments, the *Grammar* deduces what it takes to be the general form of any possible grammar, and it proceeds to elaborate this universal underlying structure from a consideration of "the natural manner in which we express our thoughts" (Chomsky, 2009, p. 78)

বাক্যটির অন্তর্গত বিমূর্ত কাঠামো, যা এর আর্থ ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে। দ্বিতীয়টিকে তিনি বলেন 'উপরিতল সংগঠন' ('Surface structure')। এটি বাক্যটির উপরিস্থ ধ্বনিগত সংগঠন, যা এটির ধ্বনিগত ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে। এই দ্বিতীয় রূপেই শ্রোতা বাক্যটি শ্রবণ করেন, কিংবা এই রূপেই বক্তা এটিকে উপস্থাপন করতে চান।

চমস্কি এরপর আর-একটি 'কার্তেসীয়' ধারণার সূত্রপাত করেন যে, বাক্যের গভীরতল সংগঠন এবং উপরিতল সংগঠনের অভিন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। অর্থাৎ, বাক্যের অন্তর্গত আর্থ ব্যাখ্যা-সম্পৃক্ত অন্তর্গত সংগঠন সেটির বাস্তব ধ্বনিগত সংগঠনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রকাশিত হয় না (Chomsky, 2009, p. 79)। চমস্কি-প্রদত্ত পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের উক্তরূপ ব্যাখ্যা বিরোধিতার সম্মুখিন হয়েছে, এবং পরবর্তীকালে চমস্কি নিজেই বাক্যের দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ধারণা পরিত্যাগ করেন।

৩.৫ আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারা

৩.৫.১ উইলিয়াম ভন হামবোল্ট

জার্মান দার্শনিক উইলিয়াম ভন হামবোল্ট-এর ভাষাচিন্তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তা ভাষা-দর্শনগত তত্ত্ব উপহার দেয় এবং একই সঙ্গে তা ভাষাবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণে অবদান রাখে। হামবোল্ট-এর চিন্তা হলো সাধারণভাবে ভাষার বিষয়ে তত্ত্বগত অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ভাষিক উপাত্তের অভিনিবিষ্ট পর্যবেক্ষণের একটি সংশ্লেষ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষার অধ্যয়ন মানুষের আত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে মূল ভূমিকা পালন করে। এ বিচারে বলা যায়, তিনি হার্ডারীয় রোম্যান্টিসিজমের প্রকৃত সম্পদ বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন (Chomsky, 2009, p. 79)। প্রসঙ্গত, হার্ডারীয় অনুধ্যান পরিচালিত হয়েছিল বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের যুক্তিবিদ্যাভিত্তিক বিশ্বজনীন ব্যাকরণ ('Universal Grammar')-এর ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে, হামবোল্ট বিশ্বাস করতেন, ভাষাবৈচিত্র্য ভাষার একটি বিশ্বজনীন দিক নির্দেশ করে (Humboldt, 1988)।

তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বজনীন ধারণা (concepts) এবং অনুধাবনের (understanding) রূপসমূহ একান্তভাবে মানুষের এবং সেগুলি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। আর বিশ্বজনীনের এই বিশেষ হয়ে ওঠার মধ্যে মানব-ভাষা একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান গ্রহণ করে আছে। স্পষ্টতই, এই অবস্থান অ্যারিস্টটলীয় 'বিশ্বজনীন ধারণা'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ভাষা নেহাতই একটি চিহ্ন-ভিত্তিক প্রচল নয় (সস্যুর যেমনটি মনে করতেন), যা যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। এমনকি হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে ভাষা আদৌ কোনও প্রচল নয়। তাঁর মতে, এ-রকম চিন্তা একটি ভুল অনুমানের দিকে চালিত হতে পারে যে, ভাষার আবির্ভাবের পূর্বেই বস্তুরাজি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা-বিশ্বের ('a shared conceptual world of objects') অস্তিত্ব ছিল। একইভাবে, ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিচার করা ভুল পথে পরিচালিত হতে বাধ্য, কারণ এইরূপ বিবেচনার ভিত্তি হলো ভাষা সম্বন্ধে একটি বহির্গত এবং স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিকোণ।

বস্তুত, হামবোল্ট-এর ভাষাচিন্তায় ভাষার বিশ্বজনীনতা এবং নিজস্বতা একটি বিন্দুতে মিলিত

হয়। এ-কারণেই তাঁর দৃষ্টিতে, ভাষা যোগাযোগের মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি কিছু; এটি হলো সেই পরম বিন্দু যেখানে মানুষের জ্ঞান ও অনুধাবনের নীতিসমূহ এবং মানববৈচিত্র্য একসাথে মিলিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের ভাষা-বিশ্বজনীনের ধারণাকে এক করে দেখা যায় না। হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে, ভাষা হলো একটি সংশ্রয়, যা চিন্তাকে আকার দেয়। উপরন্তু, প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে একটি যথার্থ বিশ্বদৃষ্টি[৯]। হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে, অভিজ্ঞতার সারবস্তুকে মানুষের ভাষাবোধ যে-সম্ভাব্য অন্তহীন উপায়ে রূপ বা আকৃতি দেয়, ভাষাগত বিশ্বদৃষ্টি হলো সে-সবের স্বাভাবিক ফল। উপরন্তু, যে-সূত্রাবলি এবং আর্থ রূপের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব চরিত্র উৎসারিত হয়, সেগুলি সাধারণভাবে একটি অভিন্ন ও একক নীতিকে প্রকাশ করে। হামবোল্ট-এর এই 'অভিন্ন ও একক নীতি'র ধারণাকে উৎপাদনী ব্যাকরণের বিশ্বজনীন ব্যাকরণের ধারণার সাথে মেলানো যায় না।

যাই হোক, ভাষা, চিন্তা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে হামবোল্ট যে-দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন, তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অ্যারিস্টটলীয় ভাষাদৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। ঐ ভাষাদৃষ্টিতে, ভাষা হলো একটি ইচ্ছাজাত সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড—চিরকালের মতো স্থিরকৃত কোনও ব্যবস্থা নয়। তবু, অনেক ভাষাবিজ্ঞানী (যেমন—নোয়াম চমস্কি) এই সৃষ্টিশীলতার ধারণাকে গ্রহণ করেছেন অনেকটা শিথিল অর্থে, যা হামবোল্ট-এর মূল বক্তব্যের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। কেননা, হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে সৃষ্টিশীলতার ধারণা নির্দেশ করে যে, ভাষাকে কোনও স্বাভাবিকতাবাদী (naturalistic) দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তোষজনকভাবে অধ্যয়ন করা যায় না (Humboldt, Trans. 1988)।

হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে ভাষা সৃষ্টিশীল, কেননা এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যা বাস্তব রূপ পায় কেবল অসংখ্য উক্তির মধ্যে—সীমিত সংখ্যক নিয়ম কিংবা কিছু স্থির উপাদানের মধ্যে নয়। ফলে, ভাষার ব্যবহার হলো পূর্বে অর্জিত ভাষিক জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ মাত্র। সর্বোপরি, এটি হলো উক্ত জ্ঞানের মুক্ত এবং অবিরাম সৃজনকর্ম। এই বাস্তবতা এ-ও ব্যাখ্যা করে, কেন ভাষা অনবরত পরিবর্তিত হয়। ভাষার ইতিহাস ধারণার (ideas) ইতিহাসের প্রতিফলন। সে-প্রতিফলনও যথাসম্ভব সে-সব ধারণার অন্তর্গত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে। এবং সে-কারণেই, হামবোল্ট মনে করেন, শেষ পর্যন্ত ভাষার প্রকৃত এবং যথার্থ প্রকাশ ঘটে সাহিত্যের মধ্যে।

৩.৫.২ লুদভিগ ভিটগেনস্টাইন ও ভাষাক্রীড়া

ভিটগেনস্টাইন ভাষাকে একটি গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ভাষাকে কতকগুলি নামের সংগ্রহমাত্র হিসেবে দেখেন না, বরং দেখেন শব্দ ও বাক্যের অগণিতরকম ব্যবহার এবং 'ভাষাক্রীড়া'র কতকগুলো পরিবর্তনশীল উপাদানের একটি আধার হিসেবে। এই ক্রীড়ার মধ্যে আছে বর্ণন, জ্ঞাপন, অনুমান, অনুবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, অভিবাদন, এবং কৌতুক বলা। ভাষাক্রীড়ার 'ব্যাকরণ' বুঝতে হলে বিভিন্ন ক্রীড়ার মধ্যে যে-সব বাক্য ক্রিয়াশীল সেগুলির

---

[৯]এই অবস্থান সাধারণভাবে—এবং কমবেশি ভুলভাবে—'ভাষা-আপেক্ষিকতা' অভিধায় প্রকাশিত হয়। যদিও পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর গভীর প্রভাব পড়েছে, তবু এর মধ্যে হামবোল্ট-এর মূল চিন্তার ব্যাপকতা ও জটিলতা অল্পই রক্ষিত হয়েছে।

ব্যবহার লক্ষ করা আবশ্যক। আর এ-জন্য ভাষাকে পরিবেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তঃর্ব্যক্তিক প্রতিবেশে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যে-প্রতিবেশে শব্দ ও বাক্যরাজি ব্যবহৃত হয়, সেটির বিমূর্তায়ন সম্ভব নয়, কারণ ভাষাক্রীড়া তথা ভাষা একটি সামাজিক বাস্তবতা।

ভিটগেনস্টাইন ভাষার কোনও ব্যক্তিগত নিয়ম তথা কোনও ব্যক্তিগত ভাষার (private language) অস্তিত্বের সম্ভাবনা বাতিল করে দেন। কারণ, একটি ক্রীড়ার মধ্যে ক্রিয়াশীল কোনও নিয়মকে আবশ্যিকভাবে হতে হবে সাধারণ নিয়ম; সেখানে থাকবে মতৈক্য। সুতরাং, একক কোনও ব্যক্তি-কর্তৃক অনুসরণযোগ্য কোনও নিয়ম থাকতে পরে না। ভাষিক আচরণ এবং ভাষিক সক্ষমতার প্রসঙ্গে ভাষার ব্যক্তিগত নিয়মের বিষয়টি ভিটগেনস্টাইন-পরবর্তীকালে একটি বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে ভাষার অভিজ্ঞতাবাদী ও সহজাতবাদী (বুদ্ধিবাদী) তাত্ত্বিকগণের মধ্যে। ভিটগেনস্টাইন নিজে অবিমিশ্র আচরণবাদ (behaviorism) এবং মনোবাদ (mentalism) দুটিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন সেগুলির একদেশদর্শিতার জন্যে এবং ভাষাগত বাস্তবতা থেকে সেগুলি সমানভাবে দূরে অবস্থান করে বলে। ভিটগেনস্টাইনের দৃষ্টিতে, ভাষা-ক্রীড়া আমাদের প্রাকৃতিক ইতিহাসের অংশ, কারণ কোন ধরনের পরিবেশে কীভাবে বাক্য ব্যবহৃত হয়, তা শিখেই আমরা ভাষা অর্জন করি (Wittgenstein, Trans. 2001)। এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ভাষার সমষ্টিগত তথা সামাজিক অস্তিত্বকেই বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে।

৩.৬ সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের চিন্তা

৩.৬.১ ফার্দিন্যান্দ দ্য সস্যুর

সংগঠন-নির্ভরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা মানব-ভাষার দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে, এই দুটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর-বিরোধী। তবে, ফরাসি ভাষাদার্শনিক ফার্দিন্যান্দ দ্য সস্যুরের দৃষ্টিতে ভাষার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যদুটি প্রকৃত অর্থে স্ববিরোধী নয়। সস্যুরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ভাষায় চিহ্নের ('sign') প্রকৃতি স্বেচ্ছাচারী। তবে, ভাষা স্বেচ্ছাধীনতার নীতি মানলেও এখানে আছে এই স্বেচ্ছাধীনতার বিভিন্ন মাত্রা ('degrees of arbitrariness'), যার সর্বোচ্চ রূপ হলো ব্যাকরণ। তাঁর ভাষায়, ব্যাকরণে আছে 'আপেক্ষিক তাড়না' ('relative motivation') (Saussure, Trans. 1959, p. 67)[১০]। সুতরাং, সস্যুর-এর দৃষ্টিতে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে স্বেচ্ছাধীনতার নীতি মেনে, তবে তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে নানা শর্ত আরোপের মাধ্যমে, যে শর্তগুলো হলো প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ :

> In fact, the whole system of language is based on the irrational principle of the arbitrariness of the sign, which would lead to the worst sort of complication if applied without restriction. (Saussure, Trans. 1959, p. 133)

---

[১০]সস্যুর চিহ্ন ('*sign*') বলতে বোঝান শব্দ-চিত্র ('sound-image') এবং তা থেকে উদ্ভূত কিংবা তা দ্বারা প্রকাশিত ধানণা ('concept') মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ফলকে। শব্দ-চিত্রকে তিনি বলেন *'signifier'*, আর ধারণাকে বলে *'signified'*। সস্যুরের মতে: The bond between the signifier and the signified is arbitrary. Since I mean by sign the whole that results from the associating of the signifier with the signified, I can simply say : *the linguistic sign is arbitrary*. (Saussure, trans. 1959, p. 67)

উল্লিখিত শর্তসমূহ কিংবা ভাষার স্বেচ্ছাচারিতা—কোনওটিই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ, ভাষা ব্যক্তিগত হতে পারে না। এ কারণেই, সস্যুর বলেন, ভাষা সৃষ্টি করেছে মানব-সমাজ:

> The arbitrary nature of the sign explains in turn why the social fact alone can create a linguistic system. The community is necessary if values that owe their existence solely to usage and general acceptance are to be set up; by himself the individual is incapable of fixing a single value. (Saussure, Trans. 1959, p. 133)

আমরা দেখেছি যে, ভিটগেনস্টাইনও ব্যক্তিগত ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। বিপরীতক্রমে লক্ষণীয় যে, উৎপাদনী ভাষাচিন্তায় ব্যক্তিগত ভাষার ('Private language') অস্তিত্বের বাধ্যবাধকতা, সেটির সঙ্গে জনভাষার ('Public language') পার্থক্য এবং ব্যক্তিগত ভাষার রূপ বর্ণনা করা হয়েছে (Fodor, 1975)।

ভাষার প্রকৃতি বিষয়ে সস্যুরের আরেকটি মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সস্যুর, খ্রিস্টপূর্ব ভারতীয় ব্যাকরণবিদ ভর্তৃহরির মতো, ভাষা ও চিন্তাকে অবিভাজ্য বলে মনে করেন। ভাষাকে তিনি তুলনা করেন একটি কাগজের পাতার সঙ্গে। পাতাটির সম্মুখ দিকটি হলো চিন্তা, আর পেছনের দিকটি হলো শব্দাবলি। কাগজের একটি দিককে না কেটে কেউ অন্য দিকটিকে কাটতে পারে না। ভাষাতেও তেমনি শব্দ ও চিন্তাকে পরস্পর থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। সস্যুরের মতে, এ-রকম বিভাজন কেবল সম্ভব বিমূর্তায়িত রূপে ('abstructedly')। আর এ-রকম বিভাজনের ফলে কেবল পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্ব, কিংবা বিশুদ্ধ ধ্বনিতত্ত্ব (Saussure, Trans. 1959, p. 113)।

ভাষা অর্জন বিষয়ে সস্যুরের কোনও নির্দিষ্ট মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে তাঁর ভাষা অর্জনের সম্ভাব্য তত্ত্বটি অনুমান করা যেতে পারে।

সস্যুরের কাছে ভাষার প্রকাশ্য রূপটি ('human speech') বহুপার্শ্বিক ('many-sided') ও বিবিধজাতিক ('heterogeneous')। বহু পা-বিশিষ্ট একটি প্রাণীর মতো এটি কয়েকটি দিকে—ভৌত, শারীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক—একই সঙ্গে পা বাড়িয়ে আছে। কারণ, এটি একই সাথে একটি সামাজিক উৎপাদ ('social product') এবং প্রয়োজনীয় প্রচলের বা প্রথার সমষ্টি ('a collection of necessary conventions'), প্রতিটি মানুষের ব্যবহারের জন্য যেটিকে একটি সমাজ অনুমোদন দিয়েছে এবং গ্রহণ করেছে। এটি একই সাথে ব্যক্তি এবং সমাজের সাথে সম্পর্কিত। মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ, ব্রোকা এলাকা ('Broca's area'), কথা বলার জন্য নির্ধারিত—ব্রোকা (Broca) এই তথ্য আবিষ্কার করার পরেও সস্যুর স্বীকার করেন না যে, বচনের (speech) ব্যবহার প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত একটি অনুষদকে কেন্দ্র করে ঘটে। তাঁর দাবি, আমাদের পা যেমন হাঁটার জন্য পরিকল্পিত, আমাদের বাগযন্ত্র তেমন করে কথা বলার জন্য পরিকল্পিত নয়। মস্তিষ্কের উল্লিখিত বিশেষ অংশটিও বচনের সাথে সাথে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার ভাষার ধারণাগত রূপটিও (*langue*) সস্যুরের দৃষ্টিতে অর্জিত ও প্রচলমূলক ('acquired and conventional') (Saussure, Trans. 1959, pp. 9-10)। ভাষাকে কোনও প্রাকৃতিক উৎসের সাথে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত বলে সস্যুর মনে করেন না। বরং

তিনি ভাষাকে একটি প্রচল এবং অর্জনযোগ্য প্রপঞ্চ (phenomenon) বলেই মনে করেন। সে-বিচারে ভাষা অর্জনের তত্ত্বে সস্যুরকে অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে ধরে নেওয়াই সঙ্গত।

৩.৬.২ লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড

আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্দ ব্লুমফিল্ডও, সস্যুরের মতো, ভাষাকে শিখনযোগ্য এবং প্রচল বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের কোনওমতেই ভোলা উচিত নয় যে, "ভাষা হলো প্রশিক্ষণ ও অভ্যাসের একটি ব্যাপার" (Bloomfield, 1935, p. 34)। কোনও-না-কোনও মানবগোষ্ঠীতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেকটি শিশুকে জীবনের প্রথম বছরগুলিতে কথা বলা এবং অনুধাবনের এইসব অভ্যাস অর্জন বা আয়ত্ত করতে হয়। ব্লুমফিল্ড-এর মতে, 'জীবনের প্রথম বছরগুলোতেই' শিশুর ভাষা অর্জন হলো, "সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব" (Bloomfield, 1935, p. 29)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ভাষা অর্জন কোনও অন্তর্গত ব্যাকরণ দাবি করে না। এতে কেবল প্রয়োজন হয় 'পুনরাবৃত্তি' কিংবা 'অনুকরণের' 'একটি জন্মসূত্রে পাওয়া প্রবণতা' ('an inherited trait')। ভাষা অর্জন বিষয়ে ব্লুমফিল্ড সুনির্দিষ্ট কোনও তত্ত্ব নির্মাণ করেননি। তবে তিনি ভাষা অর্জন বিষয়ে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ-নির্ভর প্রক্রিয়ার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন (Bloomfield, 1935, pp. 29-31):

১. নানারূপ উদ্দীপকের প্রভাবে শিশু ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং তার পুনরাবৃত্তি করে। এটিকে ব্লুমফিল্ড মনে করেন একটি জন্মসূত্রে পাওয়া প্রবণতা। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন : ধরা যাক, শিশুটি একটি শব্দ ('noise') উচ্চারণ করলো যেটিকে ইংরেজিতে *da*-রূপে বর্ণনা করা যায়। শিশুটি শব্দটির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এবং সেটি শিশুটির নিজের কানে আঘাত করতে থাকে। এভাবে এটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। মুখের একই রকম নড়াচড়া হয় এ-রকম কোনও শব্দ বড়োদের থেকে শুনে সে তার অভ্যাসমতো সেটি উচ্চারণ করে। এই আধো-বোল শিশুকে একটি ভাষার শব্দ শুনে তা উচ্চারণ করতে শেখায়।

২. মা কিংবা অন্য কেউ শিশুটির সামনে এমন কোনও একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, যেটি তার আধো-বোলের কোনও একটির সাথে মেলে। শিশু শব্দটি শুনলে তার অভ্যাস ফিরে আসে এবং সে সবচেয়ে কাছাকাছি আধো-বোলটি বলে। তখন আমরা বলি যে, শিশুটি অনুকরণ করতে শুরু করেছে।

৩. মা কোনও বস্তু (ধরা যাক, একটি পুতুল। বস্তুটি তখন একটি উদ্দীপকের কাজ করে) সাথে নিয়ে শিশুটির সঙ্গে সেটির সম্বন্ধে কথা বলেন। পুতুলটি শিশুটিকে দেখাতে দেখাতে কিংবা দিতে দিতে হয়তো তিনি 'doll' শব্দটি উচ্চারণ করেন। দেখা ও শোনার এই যুগপৎ ক্রিয়া বারবার ঘটতে থাকে। এভাবে শিশুটির একটি নতুন অভ্যাস তৈরি হয়। এখন সে বস্তুটি দেখে ও শব্দটি শুনে উচ্চারণ করে *da* । এটি এখন একটি শব্দ (word)। বয়স্কদের কাছে এটিকে শব্দ মনে না হতে পারে, তবে তা নিছক ত্রুটি ('imperfection')। ব্লুমফিল্ড মনে করেন না যে, শিশু নিজে কোনও শব্দ উদ্ভাবন করতে পারে।

৪. পুতুল দেখে *da* বলার অভ্যাস থেকে শিশুর আরো অভ্যাসের জন্ম হয়। ধরা যাক, দিনের পর দিন ঠিক গোসলের পর শিশুটিকে পুতুলটি দেওয়া হয়, এবং সে বলে চলে *da, da, da* । এখন তার অভ্যাস হয়েছে গোসলের পরপর *da, da, da* বলার। কোনও একদিন মা পুতুলটি দিতে ভুলে গেলেন। তখন শিশুটি *da, da, da* বলে চিৎকার করতে লাগলো। মা

বললেন ‘ও পুতুলটা চাচ্ছে।’ মা ঠিকই বললেন। ‘চাওয়া’ কথাটি একই পরিস্থিতির একটি অপেক্ষাকৃত জটিল রকমফের। এখন শিশুটির ভাষার উত্তরণ হলো বিমূর্ত (*abstract*) বা স্থানান্তরিত (*displaced*) উক্তিতে; এমন একটি জিনিসের কথা সে বলতে শিখলো, যা সেই মুহূর্তে সেখানে অনুপস্থিত।

৫. এরপর শিশুর ভাষা তার ফলাফলের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে নিখুঁত হতে শুরু করে। পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত তার অপেক্ষাকৃত যথার্থ উক্তি ব্যবহারের চেষ্টা অনুকূল সাড়া পায়, আর ব্যর্থতার ফল হয় বিপরীত। যেমন—*da* বললে সে পুতুলটি পায় না, কিন্তু *doll*-এর কাছাকাছি কিছু বললে সে পুতুলটি পায়। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

একই সাথে একই প্রক্রিয়ায় শিশু শ্রোতার ভূমিকাও গ্রহণ করতে শেখে। এই দুই ভূমিকা ক্রমশ একীভূত হতে থাকে। এভাবে একসময় সে নতুন শব্দ একই সাথে বলতে এবং বুঝতে শেখে। এর উল্টো প্রক্রিয়াও ঘটে। যখনই সে নতুন শব্দ বা বাক্যে সাড়া দিতে শেখে, সাথে সাথে সে উপযুক্ত পরিবেশে সেসব শব্দের ব্যবহার করতেও শেখে।

নতুন শব্দ বা বাক্য শুনে যথাযথভাবে সাড়া দিতে পারাটাকে ব্লুমফিল্ড অধিকতর জটিল প্রক্রিয়া বলে মনে করেছেন। কারণ, পরবর্তী জীবনে একজন মানুষ এমন অনেক বাক্য বুঝতে পারে, যা সে কখনো ব্যবহার করে না, কিংবা কদাচিৎ করে। একেক পরিস্থিতিতে একেকভাবে সাড়া দেওয়া কিংবা বাক্য নির্মাণের পেছনে যে-কর্মপ্রক্রিয়া কাজ করে, ব্লুমফিল্ড-এর চোখে তা ‘খুবই অস্পষ্ট’। বাক্য নির্মাণের ‘প্রায় অন্তহীন সম্ভাবনা’র পেছনের যন্ত্রকৌশল ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট দুটি তত্ত্বের উল্লেখ ব্লুমফিল্ড করেছেন (Bloomfield, 1935, pp. 32-33)। একটি হলো মনোভিত্তিক তত্ত্ব (mentalistic theory), অন্যটি বস্তুভিত্তিক তত্ত্ব (materialistic theory)। উক্ত মনোভিত্তিক তত্ত্ব উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে প্রবলভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বস্তুভিত্তিক তত্ত্ব রূপ পায় ভাষার আচরণবাদী (কিংবা অন্য অর্থে অভিজ্ঞতাবাদী) অনুসন্ধানে। স্পষ্টতই, ব্লুমফিল্ড নিজে ভাষা অর্জনের যে-প্রক্রিয়া বা ধাপসমূহ বর্ণনা করেছেন, তা আচরণবাদী তথা অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তার সপক্ষেই তাঁর অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়।

৩.৭ ভাষা-মনস্তাত্ত্বিকগণের চিন্তা

৩.৭.১ জাঁ পিয়াজে

সুইস জীববিজ্ঞানী ও মনোবিদ জাঁ পিয়াজে (Jean Piaget) মানবজ্ঞানের উৎসের সন্ধানে শিশু-মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন। পিয়াজের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছিলো এই প্রস্তাবনা থেকে যে, সকল জীব তাদের চারপাশের পরিবেশের সাথে আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখে। এই প্রারম্ভ-বিন্দু থেকে যাত্রা করে পিয়াজে দেখতে পান যে, শিশু তার জ্ঞানের নির্মাণপ্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পুরনো জ্ঞান নতুন জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয় এবং তার ভিত্তিতে পুরনো জ্ঞানের সংশোধন ও পুনর্গঠন চলে। পিয়াজের অনুসন্ধানে ধারণাসমূহ (Phenomena—স্থান, কাল, সময়, সংখ্যা, কার্যকারণ ইত্যাদি)-এর অস্তিত্ব জন্মপূর্ব নয় (Piaget, trans. 1959)। এমন নয় যে, শিশুর মস্তিষ্কে সেসব ধারণা দিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা সেসব আগে থেকেই থাকে এবং পৃথিবীতে এসে শিশুকে সেসব কেবল খুঁজে নিতে কিংবা আবিষ্কার করতে হয়। বরং, ঐ সব

ধারণা শিশুকে নির্মাণ করে নিতে হয়, কিংবা উদ্ভাবন করতে হয় শৈশবের দিনগুলোতে চারপাশের পৃথিবীর সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। পিয়াজের এই দৃষ্টিকোণকে 'নির্মাণবাদ' (constructivism) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, নির্মাণবাদ পিয়াজেকে একই সাথে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদ ও সহজাতবাদ থেকে পৃথক করেছে। পিয়াজের নির্মাণবাদ শিশুর সক্রিয় জ্ঞান-নির্মাণের স্বাধীনতার ওপর জোর দেয়। লক্ষণীয় যে, ব্লুমফিল্ড-এর পর্যবেক্ষণ—ভাষা অর্জন শিশুর সবচেয়ে বড়ো বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব—ভাষা অর্জনে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়ে পিয়াজের ধারণার সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। পরিবেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের শুরুর দিনগুলিতে শিশু এই নির্মাণে অংশ নেয়। পিয়াজের দৃষ্টিতে নির্মাণ একটি চলমান প্রক্রিয়া; **ব্যক্তি এবং সমাজ অবিরত জগৎ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তবে পিয়াজের অনুসন্ধানের মূল অবস্থান-বিন্দু হলো: শিশু জ্ঞান অর্জনের যে-ধাপসমূহের মধ্য দিয়ে যায় এবং সেই ধাপসমূহ যে-নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে, তা বিশ্বজনীন।**

শিশুর ভাষা কিংবা ভাষা অর্জন বিষয়ে পিয়াজে কোনও আগ্রহ দেখাননি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষা চিন্তার প্রকাশের একটি সহায়ক উপায় মাত্র এবং ভাষিক জ্ঞান শিশুর সার্বিক জ্ঞানের কোনও স্বাধীন এমনকি একান্ত আবশ্যিক উপাদানও নয়। ভাষা অর্জন প্রক্রিয়া শিশুর সাধারণ জ্ঞানগত বিকাশের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং সেটির স্থান জ্ঞানোন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরে—পিয়াজের এই মত ভাষা অর্জনের চর্চার ক্ষেত্রে বিতর্ক তৈরি করেছে। এ-ক্ষেত্রে পিয়াজের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে ভাষা অর্জনের সহজাতবাদী তত্ত্ব। বাস্তবে এই বিষয়ে ১৯৭০-এর শেষের দিকে নোয়াম চমস্কির সাথে পিয়াজের বিতর্ক হয় (Piattelli-Palmarini, 1983)। কারণ চমস্কি বিশ্বাস করেন, ভাষা হলো মানব-মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অনুষদ, যেটির গড়ে-ওঠার নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। তাছাড়া, চমস্কি ভাষার একটি সহজাত তথা অন্তর্গত বিশ্বজনীন ব্যাকরণেও বিশ্বাস করেন।

৩.৭.২ লেভ ভিগোটস্কি

রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী লেভ ভিগোটস্কি শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের (psychic development) পর্যায়সমূহের অধ্যয়ন করেছেন। শিষ্য লুরিয়া-র সাথে তিনি মনের জন্ম বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন (Luria & Vygotsky, Trans. 1992)। এই গ্রন্থে তাঁরা নরবানর (ape), আদিম মানব ('primitive' man) এবং মানবশিশুকে মনক্রিয়ার (psychic functions) আদি পর্যায়সমূহের একেকটি ধাপ হিসেবে বিবেচনা করেন। ভাষা ও অন্যান্য চিহ্ন-সংশ্রয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তিনি মানব-আচরণের একটি সুনির্দিষ্ট বিশ্বজনীন উপকরণ হিসেবে দেখেন এবং তার ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা মানব-মন ও চেতনার (consciousness) বিকাশের মূলগত শর্তগুলো কী তা উদ্ঘাটন করে। ভাষার বিকাশের প্রাথমিক ধাপসমূহ বিশ্লেষণ করে ভিগোটস্কি দেখান যে, ভাষিক সক্রিয়তার এই আদিম রূপসমূহ প্রকৃত অর্থেই সম্ভাবনায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সংশ্লিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির এই রূপসমূহের প্রয়োজন হয়। ভাষা ও চিন্তার মধ্যে গতিশীল প্রায়োগিক আন্তঃসংযোগ (dynamic functional interconnection) ছিল ভিগোটস্কির মূল অনুসন্ধানের বিষয়, যা তাঁর প্রধানতম গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে (Vygotsky, Trans. 1962)। এই গ্রন্থে ভাষা ও চিন্তা—উভয়ই

বিবেচিত হয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে সংঘটিত সক্রিয়তা হিসেবে; কোনও স্থির ধারণা হিসেবে নয়। প্রত্যেকটিই হলো একেকটি জটিল বাস্তবতা, যার রয়েছে অন্তর্গত ইতিহাস। এমনকি লিখিত ভাষাকে তিনি ভাষিক আচরণের স্বতন্ত্র একটি প্রায়োগিক প্রকাশ হিসেবে দেখেন। এটি, তাঁর দৃষ্টিতে, সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি স্বতন্ত্র পর্যায় এবং সে-কারণেই মৌখিক বচন (oral speech) থেকে ভিন্ন। চিন্তা ও ভাষার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এক গতিশীল অন্তর্গত বচনের ধারণা হলো ভিগোটস্কির সবচেয়ে মৌলিক অবদান। ভিগোটস্কির মতে, শিশুর একেবারে প্রথম পর্যায়ের ভাষিক আচরণও সামাজিক আন্তঃসংযোগের অংশ। বস্তুত এটি জাঁ পিয়াজে-কথিত শিশুর আত্মকেন্দ্রিক বচন ('egocentric speech')[১১]-এর ধারণার একটি সমালোচনা। শিশুরা আসলে তখন (তাদের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে) সামাজিক পরিবেশের সাথে আন্তঃসংযোগের মধ্য দিয়ে তাদের ভাষিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে নিচ্ছে, যা বাস্তবতার ব্যবহারিক দক্ষতাবৃদ্ধির অংশ। পিয়াজের চিন্তার বিপরীতে ভিগোটস্কি বলেন, চিন্তা ও ভাষার দিকে শিশুর যাত্রা হলো বহির্গত থেকে অন্তর্গত আচরণগত কর্মকাণ্ডের দিকে যাত্রা। তবে, পিয়াজে এবং ভিগোটস্কি উভয়ই ভাষার সামাজিক চরিত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন (Piaget, Trans. 1995; Vygotsky, Trans. 1994, Smith, Dockrell & Tomlinson, 1997-এ উদ্ধৃত)। বস্তুত, চিন্তা ও ভাষার সম্পর্ক বিষয়ে ভিগোটস্কির অনুসন্ধান বহু শৃঙ্খলাকে অঙ্গীভূত করেছে, যেমন—মনোভাষাবিজ্ঞান (psycholinguistics), স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান (neurolinguistics), সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান (structural linguistics), চিহ্নবিজ্ঞান (semiotics), জ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (cognitivism)।

৩.৮ আচরণবাদী তত্ত্ব: বি. এফ. স্কিনার

আমেরিকান আচরণবাদী মনস্তত্ত্ববিদ বি. এফ. স্কিনার মানব-আচরণের নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা (Experimental Analysis of Behavior—EAB)-র ধারা প্রবর্তন করেন। এই ধারার ভিত্তি হিসেবে তিনি যে-দর্শন অবলম্বন করেন, তাকে বলা হয় বৈপ্লবিক আচরণবাদ (radical behaviorism) (Skinner, 1938, 1974)। EAB অনুযায়ী, যে-কোনও আচরণকে তিনটি অংশে ভেঙে ফেলা যায়: বিভাজক উদ্দীপক (discriminative stimulus—যে-বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে জীবটি অবস্থান করছে), আচরণ প্রতিক্রিয়া (operant response)[১২], এবং অন্য একটি উদ্দীপক—*পুরস্কারক* (reinforcer) কিংবা *শাস্তিদায়ক* (punisher) স্কিনার ব্যাখ্যা করেন, আচরণ নিয়ন্ত্রণ (Operant conditioning) হলো একটি সাধারণ শিখন-যন্ত্রকৌশল (learning mechanism), আর সেটা তখনই ঘটে যখন একটি উদ্দীপক (পুরস্কারক কিংবা শাস্তিদায়ক) বিভাজক উদ্দীপকের উপস্থিতিতে পরীক্ষাধীন জীবটি-কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি আচরণ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেয়। স্কিনারের মনস্তত্ত্বে অন্তর্গত

---

[১১] পিয়াজে শিশুর ভাষাকে দুটি মৌলিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: *আত্মকেন্দ্রিক* বচন (egocentric speech) ও *সামাজিকায়িত* বচন (socialized speech)। ভাষা অর্জনের প্রথমদিকে মূলত শিশুর বচন আত্মকেন্দ্রিক হয়। ধীরে ধীরে এর সামাজিকায়ন ঘটে এবং সাত বছর বয়সের দিকে শিশুর বচনে উক্ত দ্বিতীয় ধরনটি বেশি প্রকাশ পায় (Singer & Revenson, 1996, pp. 57-72)।

[১২] *আচরণ* প্রতিক্রিয়া হলো এমন একটি আচরণ যাকে তার পরিণতির ভিত্তিতে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। অর্থাৎ, পরে ঐ আচরণ কম (শাস্তি পেলে) অথবা বেশি (পুরস্কৃত হলে) ঘটবে।

মানসিক অবস্থাকে (inner mental states) আচরণের কারণ হিসেবে না দেখে স্বয়ং সেটিকেই আচরণ (operant responses)[১৩] হিসেবে দেখা হয়, অন্য যে-কোনও আচরণের মতো যেটিকে বহির্গত উদ্দীপকের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আচরণ নিয়ন্ত্রণ হলো একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া, যা অনেকটা প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)-এর মতো, নতুন সাড়া নির্বাচনের বিষয়টি নির্ধারণ করে। আচরণ নিয়ন্ত্রণ-এর মাধ্যমে যে-কোনও মানব-আচরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে স্কিনার দাবি করেন। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত (চমস্কির 'উৎপাদনী ব্যাকরণ'-এর পরিকল্পনায় যাঁর গভীর প্রভাব আছে) তাঁর *Discourse on Method* গ্রন্থে মানব-মনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। দেকার্ত মনে করতেন যে, কোনও যান্ত্রিকতাই মানুষের ভাষা ও যুক্তিপ্রক্রিয়ার (reasoning) উৎপাদনশীলতা (productivity) এবং ব্যবহারিক যথার্থতা (pragmatic appropriateness)[১৪] ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু স্কিনার (Skinner, 1957) EAB-র ধারণা ও পদ্ধতির সাহায্যে দেখাতে চেষ্টা করেন যে, ভাষার উৎপাদনশীলতা এবং ব্যবহারিক যথার্থতা যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ভাষার ব্যবহারিক যথার্থতার বর্ণনায় স্কিনার বাক্যকে একটি সমগ্র একক হিসেবে গ্রহণ করেন, এবং দেখান, কীভাবে পরিবেশ, বিশেষ করে ভাষিক সমাজ (verbal community), ভাষিক সাড়ার রূপ নির্ধারণে পুরস্কারক এবং শাস্তিদায়ক জোগান দেয়। ভাষা উৎপাদনের বর্ণনায় স্কিনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন শব্দের (word) ওপর, এবং দেখানোর চেষ্টা করেন, কীভাবে শিশুর ভাষিক সমাজ-কর্তৃক সরবরাহকৃত পুরস্কারক ও শাস্তিদায়ক উপাদানসমূহ বাক্য গঠনে ভূমিকা রাখছে।

ভাষার আচরণবাদী ব্যাখ্যায় স্কিনারের উপর্যুক্ত উদ্যোগ চমস্কির প্রবল আক্রমণের শিকার হয় (Chomsky, 1959)। চমস্কির উদ্দীপনার অপ্রতুলতা (poverty of stimulus) বিতর্ক অনুযায়ী, আচরণ নিয়ন্ত্রণ-এর সাহায্যে ব্যাকরণসম্মত ভাষিক সাড়ার (অর্থাৎ, বাক্য বা ভাষার) অর্জন কিংবা উৎপাদনের সক্ষমতা ব্যাখ্যা করা যায় না। উদ্দীপনার অপ্রতুলতার তত্ত্বমতে, ভাষিক পরিবেশ শিশুকে পর্যাপ্ত প্রসম্ভার তথা উদ্দীপক সরবরাহ করে না। অন্যভাবে বললে, উক্ত উদ্দীপক (কিংবা চমস্কির ভাষায়, evidence—প্রমাণ) এত বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল যে, শিশু তার চারপাশে কথিত ভাষা থেকে ঐ ভাষার ব্যাকরণ অর্জন করতে পারে না। ভাষিক উদ্দীপক বিশৃঙ্খল (unsystematic), কারণ তাতে কোনও নেতিবাচক প্রমাণ (negative evidence—যে-প্রমাণ ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ ভাষিক উৎপাদ-কে ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে) থাকে না। আবার, ভাষিক উদ্দীপক দুর্বল (weak), কারণ এতে ইতিবাচক প্রমাণ-এর (positive evidence—যে-প্রমাণ ব্যাকরণসম্মত ভাষিক উৎপাদ-কে ব্যাকরণসম্মত বলে চিহ্নিত করে) মান নিম্ন। উপরন্তু, যেহেতু শিশু তার ভাষার সকল ব্যাকরণসম্মত বাক্যের একটি ছোট সীমিত অংশ মাত্র শুনতে পায়, সুতরাং সে কোনও ব্যাকরণসম্মত বাক্যের অনুপস্থিতিকে ব্যাকরণগত অশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তবু, নিজের ভাষিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপকের প্রকৃতি এত দীন হওয়া সত্ত্বেও, শিশু

[১৩] আচরণবাদী মনস্তত্ত্বে ভাষাকে একটি আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

[১৪] বাস্তব পরিবেশে ভাষা ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভাষার সঠিক ব্যবহার করার যে-ক্ষমতা। চমস্কি-কথিত কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞানে—এবং চমস্কির নিজের রচনাতেও—এই ক্ষমতাকেই হামবোল্ট-এর উক্তি অনুযায়ী বলা হয়েছে 'ভাষা ব্যবহারের সৃষ্টিশীল দিক' (Chomsky, 2009)।

স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ দ্রুততার সঙ্গেই স্বভাষা (native language) অর্জন করে।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, স্কিনারের *Verbal Behavior* নানা অর্থেই ভাষার ব্যবহারিক যথার্থতার ব্যাখ্যা দেয় (মানব-মনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয় বলে দেকার্তের যে-দাবি, স্কিনারের ব্যাখ্যা তার একটি উত্তর), কোনও প্রচলিত ব্যাকরণগ্রন্থ তা দিতে পারে না। তবে, স্কিনারের অনুসন্ধান ভাষার উৎপাদনশীলতার কোনও যান্ত্রিক ব্যাখা দিতে পারে না (দেকার্তের অপর দাবি) বলে চমস্কি যে-বিতর্ক করেছেন, তা যথার্থ। উক্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে চমস্কির উৎপাদনী ব্যাকরণ বরং সম্পূর্ণ সক্ষমতা দাবি করতে পারে। সার্বিক বিচারে, ভাষার অর্জন-সংক্রান্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে চমস্কি এবং স্কিনার সমান-সমান কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

৩.৯ উৎপাদনী ব্যাকরণ

ভাষাবিজ্ঞান এবং ভাষা-অর্জন সংক্রান্ত যে-কোনও অনুসন্ধান বা আলোচনায় চমস্কির রচনাসমূহের উল্লেখ অপরিহার্য। বস্তুত ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর মতো প্রভাববিস্তারী ব্যাপকতা নিয়ে আর-কেউ আবির্ভূত হননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "রূপান্তরমূলক-উৎপাদনী ব্যাকরণ" (Transformational-Generative Grammar)-এর মূল কথা উল্লেখ্য—

১. প্রত্যেক মানুষ ভাষা-সংক্রান্ত অভিন্ন জ্ঞান নিয়েই জন্মায়। এই জ্ঞানকে চমস্কি বলেন 'নীতি' ও 'উপনীতি' (Principles and Parameters)। মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশ (Module) এইসব নীতি ও উপনীতিকে ধারণ করে। মস্তিষ্কের এই অংশকে চমস্কি নাম দেন LAD (Language Acquisition Device)। পরে তিনি উদ্ভব ঘটান UG (Universal Grammar) ধারণার। চমস্কি একে Language Faculty নামেও অভিহিত করেন (Chomsky, 1995)।

২. মানুষের UG তথা Language Faculty নির্দিষ্ট কোনও ভাষার পরিবেশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে সেই ভাষার 'উপনীতি'সমূহ (Parameters) UG-কে সক্রিয় করে তোলে এবং সেই ব্যক্তি সেই ভাষা শেখে। উপনীতিসমূহ হলো নির্দিষ্ট কোনও ভাষার ব্যাকরণ। এই তত্ত্ব "শাসন ও বাঁধনতত্ত্ব" (Government and Binding theory) তথা "প্রমিত তত্ত্ব" (Standard Theory) নামে পরিচিত হয় (Chomsky, 1965, 1981)।

৩. প্লেটো, পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ ও কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞানের ধারাতেই নোয়াম চমস্কির অবস্থান। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাক্যের সংগঠন বিশ্লেষণে প্রবর্তন করেন পদসংগঠন (Phrase-structure—PS)-এর ধারণার। চমস্কি তাঁর তত্ত্ব নির্মাণে এই ধারণার প্রয়োগ ঘটান। তবে তিনি এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেন 'রূপান্তর' (Transformation)-এর ধারণার। চমস্কি তাঁর বহুলকথিত 'রূপান্তর'-এর ধারণার জন্য পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের কাছে ঋণী (Chomsky, 2009)। মানুষের জন্মগত ভাষাজ্ঞানের ধারণাকে তিনি শুধু গ্রহণই করেননি, সেটাকে একটা চরম রূপ দিয়েছেন। অনেক অভিজ্ঞতাবাদী ও আচরণবাদী ভাষাবিজ্ঞানী *tabula rasa*-র ধারণাটিকে মেনে নিতে প্রস্তুত এই অর্থে যে, একখণ্ড পাথরের যেমন একটা মূর্তি হয়ে উঠবার স্বাভাবিক যোগ্যতা বা সম্ভাবনা থাকে, তেমনি একটি শিশুরও থাকে ভাষা অর্জনের ক্ষমতা। কিন্তু চমস্কির দাবি এতখানি যে তিনি বলেন, "শেখার প্রস্তুতি" (learning readiness), প্রবণতা (biases) ও মানস-গঠন (dispositions) যেমন শিশুর আবশ্যিকভাবে থাকে, তেমনি থাকে সক্রিয় ও সুনির্দিষ্ট একগুচ্ছ "ভাষিক যন্ত্রকৌশল" (linguistic mechanisms) (Searle,

1972)। এ-কারণে চমস্কি বলেন, "ভাষাবোধ"(linguistic competence)-এর কথা, যা দিয়ে মানবশিশু পূর্বে-অশ্রুত বাক্য বুঝতে ও নির্মাণ করতে পারে। এই ভাষিক ক্ষমতাকে চমস্কি তাঁর ভাষা-সংগঠন মডেলের "গভীরতল সংগঠন" (Deep Structure)-এর অন্তর্ভুক্ত করেন, যার ধ্বনিগত (phonetic) প্রকাশ ঘটে "উপরিতল সংগঠন" (Surface Structure)-এর মাধ্যমে। উভয় তলের মাঝখানে কাজ করে রূপান্তর সূত্রাবলি (Transformation Rules)। নিচের চিত্রে উৎপাদনী ব্যাকরণ-প্রস্তাবিত পূর্বতন (Chomsky, 1965, 1975, 1981) ভাষা মডেলের একটি সরল রূপ উপস্থাপন করা হলো—

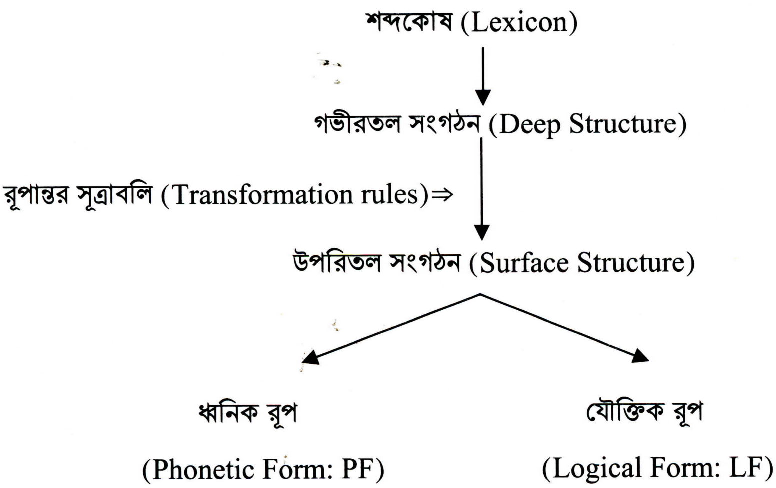

চিত্র: *ভাষা অনুষদের পূর্বতন উৎপাদনী রূপ (Jackendoff, 1997, p. 85 অনুসরণে কিছু ব্যাখ্যাত্মক অনুপুঙ্খ ব্যতিরেকে উপস্থাপিত)। এর সঙ্গে উৎপাদনী ব্যাকরণ-প্রস্তাবিত পরবর্তী (Chomsky, 1995) ভাষা-মডেলের (এই অনুচ্ছেদে কিছু পরে উপস্থাপিত) তুলনা করা যেতে পারে।*

বাক্যকেই চমস্কি ভাষার প্রাণকেন্দ্র বিবেচনা করেছেন। তাঁর প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *Syntactic Structures*-এ (Chomsky, 1957) তিনি প্রবর্তন করেন "ব্যাকরণের স্বাধীনতা"র (The independence of grammar) ধারণার। অর্থাৎ, ব্যাকরণ তাঁর কাছে বাক্য উৎপাদনের একটি যন্ত্র, যে-যন্ত্র সসীম সংখ্যক উপাদান (ধ্বনি, শব্দ) থেকে অসীম সংখ্যক শুদ্ধ এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য উৎপাদন করবে। এই ব্যাকরণকে তিনি বাক্যের অর্থ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন।

পরে অবশ্য চমস্কিরই ছাত্র G. Lakoff, J. McCawley ও J. Ross-সূচিত "উৎপাদনী অর্থতত্ত্বের" (Generative Semantics) প্রভাবে চমস্কি তাঁর ভাষা-মডেলে অর্থকেও স্থান করে দেন। উৎপাদনী অর্থতত্ত্বের প্রবক্তাগণ দাবি করেন যে, বাক্য-সংগঠন ও অর্থতত্ত্বের মধ্যে কোনও বিভাজনকারী সীমারেখার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং চমস্কি-কথিত গভীরতল সংগঠনও অস্তিত্বহীন (Searle, 1972)।

ঐতিহাসিকভাবে, উৎপাদনী অর্থতত্ত্ব (Generative Semantics) উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশের সময় এবং পরবর্তীকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ হিসেবে বিবেচ্য। তবে এখানে এটির বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। ভাষা অর্জনের তত্ত্ব অনুসন্ধানে এটির যে-প্রাসঙ্গিকতা (বাক্যিক গভীরতল সংগঠনের ধারণার পরিবর্তে) আছে, আমরা কেবল সে-সূত্রেই এটির উল্লেখ এ স্থানে করব। সংক্ষেপে, এই তত্ত্ব দাবি করে যে, গভীরতল সংগঠনের শুধু স্থায়ী বৈশিষ্ট্যসমূহ যৌক্তিক কাঠামোর (logical structure) একটি বিমূর্ততর স্তরের সাথে সম্পর্কিত (Levine and Postal, 2004, footnote, p. 215)। অন্য কথায়, আর্থ কাঠামোসমূহ (semantic structures) কতকগুলি মূলগত বিশ্বজনীন সূত্রের রূপে উৎপাদিত হয়। এই প্রস্তাব উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের এই দাবির সাথে সাংঘর্ষিক যে, ব্যাকরণের অর্থ-সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য কাঠামোটি কেবল বাক্যিক গভীরতলই উপস্থাপন করে (Katz and Fodor, 1963; Chomsky, 1971)। এই বিতর্কের বিস্তারিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায় Newmeyer (1986a, 1986b, 1996), Harris (1993), Huck and Goldsmith (1995)-এ। বস্তুত কারক ব্যাকরণের (Case grammar) মতোই George Lakoff, James D. McCawley, Paul M. Postal, and John Robert Ross প্রমুখ উৎপাদনী অর্থতত্ত্বের প্রবক্তাগণ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে বাক্যের গভীরতল সংগঠনের ধারণা পরিত্যাগের প্রস্তাব করেন যা পরবর্তীকালে চমস্কি তাঁর 'ন্যূনতমাত্মক' (Minimalist) তত্ত্বে গ্রহণ করেন (Chomsky, 1995, pp. 150-151)। এই তত্ত্বে ভাষা অনুষদ মডেল থেকে গভীরতল সংগঠনকে (সুতরাং, উপরিতল সংগঠনকেও) বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে চমস্কি বাক্য বিশ্লেষণে "পরিমিতি"(economy) এবং "পূর্ণ ব্যাখ্যা" ('Full Interpretation'—FI) ধারণাদুটিকে অবলম্বন করেন। পরিমিতির ধারণা অনুযায়ী, ভাষা অনুষদের কাঠামো হবে "যথাসম্ভব পরিমিত" (as economical as possible), যেখানে বাক্য ব্যাখ্যায় অপ্রয়োজনীয় কোনও নিয়মের প্রয়োগ হবে না (p. 150)। "পূর্ণ ব্যাখ্যা" ধারণা অনুযায়ী, বাক্যিক উপস্থাপনায় কেবল সেই উপাদানই স্থান পাবে, যা যথাযথভাবে অনুমোদিত (properly "licensed"—p. 151)। গভীরতল সংগঠনকে তিনি আভিধানিক কাঠামোর একটি প্রক্ষেপমাত্র ('simply...a projection of lexical structure...') হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই, গভীরতলের স্থান নেয় কেবল আর্থ কাঠামো। পরবর্তী চিত্রে ভাষা অনুষদের ন্যূনতমাত্মক (Chomsky, 1995) রূপ উপস্থাপন করা হলো—

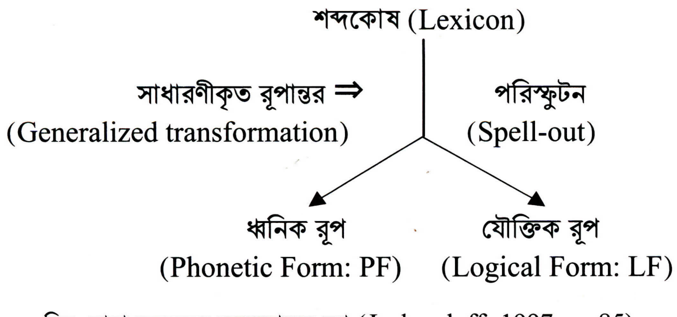

চিত্র: ভাষা অনুষদের ন্যূনতমাত্মক রূপ (Jackendoff, 1997, p. 85) অনুসরণে কিছু ব্যাখ্যাত্মক অনুপুঙ্খ ব্যতিরেকে উপস্থাপিত)। এর সঙ্গে উৎপাদনী ব্যাকরণের পূর্বতন (Chomsky, 1965, 1975, 1981) ভাষা-মডেল তুলনীয়।

চমস্কি আরো দাবি করেন, মানব-ভাষার সংগঠন মানবমনের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ফল, যার সাথে যোগাযোগের (communication) কোনও তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক নেই (Searle, 1972)—যদিও মানুষ কেবল যোগাযোগ স্থাপন ও চিন্তনের জন্যই ভাষা ব্যবহার করে। তাই অর্থকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরও *The Minimalist Program* (1995)-এ বাক্যই থেকে গেছে ব্যাকরণের কেন্দ্রে। চমস্কি ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও দেখতে রাজি নন। Seuren বলেন—

> His (Chomsky's) denial of the communicative function of language and, in general, of the social context in which speech utterances have semantic effects,...make[s] for...unclarities, uncertainties, and distortions in the basic conditions to be met by a language system.... (Seuren, 2004, p. 6)

৩.৯ কারক ব্যাকরণ

বাক্যিক গভীরতল সংগঠনের ধারণা পরিত্যাগের পিছনে আরেকটি ভাষাবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বস্তুত এটি একটি প্রাকতত্ত্ব যা কারক ব্যাকরণ (Case Grammar) নামে পরিচিত। চার্লস জে. ফিলমোর কারক ব্যাকরণ প্রাকতত্ত্বের প্রবক্তা। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষে এটি বিকাশ লাভ করেছিল (Fillmore, 1968, 1969)। এই প্রাকতত্ত্বের আওতায় ফিলমোর "কারক সম্পর্ক" (Case Relation) ধারণার প্রবর্তন করেন। সংক্ষেপে, কারক সম্পর্ক বলতে বোঝায় বিভক্তিসমূহের (case inflexions) আদি ক্রিয়া ('কাজ' অর্থে—prototypical function)।

কারক ব্যাকরণের ধারণার আওতায়, এই ক্রিয়া নিষ্ক্রিয় (neutralized) থেকেও বাক্যের পদসমূহের মধ্যে ব্যাকরণগত সম্পর্ক তৈরি করতে পারে (এই প্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ Anderson, 2006)। এই চিন্তা চমস্কি-কথিত (Chomsky, 1965) গভীরতল সংগঠন (DS)-এর স্থান দখল করে। মূলধারার রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের বিকাশের প্রথম দিকে (Chomsky, 1965, 1972, 1981, 1986) কারক ব্যাকরণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। পরে রূপান্তরমূলক বাক্যতত্ত্ব (transformational syntax) "কারক সম্পর্ক" (Case Relations—Thematic Relations, or Theta Roles) আত্তীকৃত করে এবং শেষ পর্যন্ত এর ফল দাঁড়ায় গভীরতল সংগঠনের ধারণা পরিত্যাগ (Chomsky, 1995, p. 191)। এই অর্থে চমস্কির সর্বশেষ তত্ত্ব (প্রকৃতপক্ষে, একটি কর্মসূচি—program) "ন্যূনতমাত্মক তত্ত্বকে" (*Minimalist program*) কারক ব্যাকরণেরই একটি রূপভেদ বলে বিবেচনা করা যায় (Anderson, 2006, pp. 1108-1109)। সুতরাং, ভাষা অর্জন প্রসঙ্গে কারক ব্যাকরণের গুরুত্ব এখানে যে, বাক্যিক গভীরতল সংগঠন ধারণা পরিত্যাগে এটির কৌশলগত ভূমিকা রয়েছে। কার্যত, গভীরতল সংগঠনের ধারণার পরিত্যাগে কারক ব্যাকরণ ও উৎপাদনী অর্থতত্ত্বের বিপুল গুরুত্ব রয়েছে।

৩.১০ সাম্প্রতিকতম অনুসন্ধান

এটি স্পষ্ট যে, সারা বিশ্বে ভাষা অর্জন বিষয়ক গবেষণা অন্য যে-কোনও জ্ঞানক্ষেত্রের মতো উন্নততর হচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং গবেষণা পদ্ধতি মানুষের নাগালের মধ্যে আসায় মানুষের মস্তিষ্কে ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এখন অনেক বেশি কার্যকরভাবে

অনুসন্ধানযোগ্য হয়ে উঠেছে। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রযুক্তি এবং অন্যান্য জ্ঞানক্ষেত্র সহযোগে ভাষাবিজ্ঞান তথা ভাষা অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান বর্তমানে আগের যে-কোনও সময়ের তুলনায় অগ্রসর এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করছে। ভাষা অর্জন বিষয়ক নতুন অনুসন্ধানের বিপুল কর্মকাণ্ড থেকে কিছু উদাহরণ আমরা এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। নিম্নোদ্ধৃত তথ্যসমূহ একই সঙ্গে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রটির প্রকৃত অবস্থানটি বুঝতে সাহায্য করবে এবং এর সম্ভাব্য ফল যাচাই করতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সম্প্রতি আচরণবাদী চিন্তার অনেক উপাদান এখন নতুন করে ফিরে আসছে। Erich Kandel শিখনের তিনটি পরস্পর-সম্পর্কিত রূপের—ইন্দ্রিয়-উদ্দীপন (sensitization)[১৫], ইন্দ্রিয় প্রশমন (habituation)[১৬] এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ (classical conditioning)[১৭]—আণবিক ভিত্তি (molecular basis) (Kandel et al., 2000) আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে ২০০০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

উপরন্তু, মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রের অনেক প্রতিরূপ পরিকল্পনাকারী (neural modeler) এখন স্কিনারের প্রস্তাবিত শিখন যন্ত্রকৌশলের (Skinnerian learning mechanisms) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞানগত সক্ষমতার (cognitive capacities)[১৮] সংযোগবাদী প্রতিরূপ নির্মাণে পশ্চাৎ-প্রচারণ (back-propagation)[১৯]-এর পরিবর্তে প্রবলন[২০] মূলক শিখন অ্যালগরিদম (reinforcement learning algorithms) (Poirier, 2006, p. 804) ব্যবহার করছেন।

এই নতুন প্রক্রিয়া পুরনো প্রক্রিয়ার তুলনায় প্রগণনে (computation) অনেক বেশি সুবিধা পায়, ফলে জটিল সংশ্রয়ের (যেমন—ভাষা) শিখনে এই প্রক্রিয়া অনেক বেশি উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। মস্তিষ্কের প্রগণন-প্রক্রিয়ার জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় পশ্চাৎ-প্রচারণের ধারণার তুলনায় এই প্রক্রিয়া অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

উপরন্তু, প্রবলনমূলক শিখনের শারীরবৃত্তীয় কর্মপ্রক্রিয়া বর্তমানে উদঘাটনের চেষ্টা চলছে এবং তাতে ডোপামিন (একটি রাসায়নিক উদ্দীপক) এবং ডোপামিন-ভিত্তিক পুরস্কার-ব্যবস্থা

---

[১৫] কোনও ইন্দ্রিয়কে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তিতে সাড়া দেওয়ার উপযোগী করে তোলার প্রক্রিয়া।

[১৬] কোনও উদ্দীপকের পুনরাবৃত্ত কিংবা দীর্ঘ প্রভাবে সাড়া প্রশমিত বা স্বাভাবিক হবার প্রক্রিয়া।

[১৭] রাশিয়ান মনস্তাত্ত্বিক ইভান পাভলভ-এর শিখন তত্ত্ব; এতে উদ্দীপক নিয়ন্ত্রণ কিংবা সাড়া পরিবর্তনের মতো শুধু পর্যবেক্ষণযোগ্য পদ্ধতিকে শিখনের ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা পদ্ধতি অনুসন্ধানে ব্যবহৃত হয়।

[১৮] একটি শিখন তত্ত্ব, যেখানে শিখন হলো উদ্দীপক ও সাড়ার মধ্যে স্নায়বিক সংযোগ। জ্ঞানমূলক মনস্তত্ত্বে এটি বোঝায় যে, জ্ঞান মস্তিষ্ক-স্নায়ুর বহু-বৃন্তের সংযোগের আকারে থাকে—কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় কিংবা স্মৃতিভাণ্ডারে নয়। এর অর্থ জ্ঞান স্থানীয় নয়, বিস্তৃত এবং জ্ঞান হলো নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত কতকগুলো সংযোগের একটি জালের সক্রিয়করণ। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরিতে মানব-মস্তিষ্কের উক্ত প্রতিরূপ ব্যবহার করা হয়। স্নায়ুবিজ্ঞান, মনের দার্শনিক অনুসন্ধানেও ব্যবহৃত হয়।

[১৯] কৃত্রিম স্নায়ুতন্ত্রকে কোনও নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদন করতে শেখানোর জন্য বহুল-ব্যবহৃত শিক্ষণ-পদ্ধতি।

[২০] কোনও আচরণকে পুরস্কৃত করে কোনও উদ্দীপকে সেটির আবির্ভূত হবার পরিবেশ তৈরি করা।

(reward system—যা একটি প্রবলন) অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। তাছাড়া, রোবটবিজ্ঞানে (Robotics) রোবটের উপস্থাপন ও প্রগণন সংশ্রয়ের (representations and computational systems) নকশা নির্মাণে (এই ব্যবহারিক জ্ঞান-শৃঙ্খলার বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে আচরণ-ভিত্তিক রোবটবিজ্ঞান—(Behavior-based Robotics) আচরণবাদী মনস্তত্ত্বের কর্মপদ্ধতি ব্যবহারের একটি প্রবণতা সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে (Brooks, 1999)। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের (ভাষা এর মধ্যে অন্যতম) আচরণবাদী শিখন-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ সহজাতবাদী তত্ত্বের কিছু দাবি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছে (Scholz and Pullum, 2006)। **মানুষের সহজাত সক্ষমতাসমূহ ভাষা-নির্দিষ্ট** (language-specific) **নাকি মস্তিষ্কের অ-প্রকৌষ্টিক** (domain-general) **জ্ঞান-প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ার ফল, তা নিয়ে বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। বিশেষ করে যে-জন্মগত ক্ষমতার বলে শিশু ইন্দ্রিয়গতভাবে জগতের বস্তুরাশি ও কর্মকান্ড সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ করে, সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলছে।**

এই গবেষণা-কর্মকান্ডের ভাষা অর্জন সংক্রান্ত অবস্থান হলো: ভাষা জন্ম নেয় সামাজিক পরিবেশে (social context), এবং এতে সেই শিখন যন্ত্রকৌশল (learning mechanism) কাজ করে, যা মানব-মস্তিষ্কের সাধারণ জ্ঞানমূলক শিখন উপকরণ (cognitive learning apparatus) ব্যবহার করে। এইসব উপকরণই হলো সহজাত (Bates, et al., 1998; Tomasello, 2008; Ramscar, 2007; O'Grady, 2008)।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানমূলক শিখন (statistical learning) তত্ত্ব এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহ দেখায় যে, ভাষা অর্জন প্রাথমিকভাবে সাধারণ শিখন কর্মপ্রক্রিয়াকে ভিত্তি করেই ঘটে (Saffran, Aslin Newport, 1996; Reeder, Newport & Aslin, 2010; Gleitman, & Newport, 1995; Saffran, Newport, Aslin, Tunick & Barrueco, 1997; Aslin, Saffran & Newport, 1998; Newport & Aslin, 2000; Hauser, Newport & Aslin, 2001; Creel, Newport & Aslin, 2004; Newport & Aslin, 2004; Newport, Hauser, Spaepen & Aslin, 2004)। "পরিসংখ্যানমূলক শিখন"[২১] প্রক্রিয়ার সংযোগবাদী 'মডেল' সফলভাবে শাব্দিক ও বাক্যিক প্রচল শিখাতে পারে (Seidenberg & McClelland, 1989)।

এইসব ফলাফল ভাষা অর্জন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানমূলক শিখন তত্ত্বকে সমর্থন করে। শিশুদের শব্দ ও বাক্য-সংগঠন শিখন সম্পর্কিত গবেষণাও (Saffran, Aslin & Newport, 1996) উক্ত তত্ত্বকে সমর্থন করে। অভিন্ন ফলাফল দেখা যায় ভাষা অর্জনের খণ্ডকরণ তত্ত্বে (Chunking Theory)। পরিসংখ্যানমূলক শিখন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত এই তত্ত্বে ভাষা অর্জনে পরিবেশ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় এ-তত্ত্বের সমর্থনে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় (Gobet et. al., 2001; Freudenthal, Pine & Gobet, 2005; Jones, Gobet & Pine, 2007)।

---

[২১] যান্ত্রিক শিখন মডেল যা প্রাপ্ত উপাত্তের (ভাষার ক্ষেত্রে ভাষিক উপাত্ত) পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে শিখনযোগ্য সম্ভাব্য সঠিক লক্ষ্যটি পূর্বানুমান (predict) করতে পারে।

বচনের পুনরাবৃত্তি ভাষা অর্জনে সহায়কের ভূমিকা পালন করে—ব্লুমফিল্ড-এর এই পর্যবেক্ষণের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। এর সমর্থন পাওয়া যায় কিছু গবেষণায় (Bloom, Hood & Lichtbown, 1974; Miller, 1977; Masur, 1995; Gathercole, Baddeley, 1989)।

৪. উপসংহার

ভাষা অর্জন বিষয়ক তত্ত্ব ও অধ্যয়নের উপর্যুক্ত বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ভাষা অর্জনের সহজাতবাদী তত্ত্বের সীমার বাইরে শক্তিশালী গবেষণা-পদ্ধতি এবং মতাদর্শের অস্তিত্ব সব সময়ই ছিল, এবং সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ভাষা অর্জনের বাস্তবতা সম্পর্কে সহজাতবাদী তত্ত্বের বিপরীত (অংশত) অভিমুখ নির্দেশ করছে।

তথ্য নির্দেশ

Anderson, J. M. (2006). Case Grammar, In *The Encyclopedia of Language and Linguistics* (Vol. 2, p. 220). Amsterdam: Elsevier Ltd.

Aristotle (1964). *On the Soul. Parva Naturalia. On Breath.* (W. S. Hett, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Aristotle (1938). *Categories. On Interpretation. Prior Analytics.* (H. P. Cook & H. Tredennick, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Arnauld, A. & Lancelot, C. (1975). *General and rational grammar: The Port-Royal grammar.* (J. Rieux & B. E. Rollin, Eds. and Trans.). The Hague: Mouton. (Original work published 1676)

Aslin, R. N., Saffran, J. R., & Newport, E. L. (1998). Computation of conditional probability statistics by 8-month old infants. *Psychological Science, 9,* 321-324.

Bates, E., Elman, J., Johnson, M., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D. & Plunkett, K. (1998). Innateness and emergentism. In W. Bechtel & G. Graham (Eds.), *A companion to cognitive science* (pp. 590–601). Oxford: Basil Blackwell.

Bloom, L., Hood, L. & Lichtbown, P. (1974). Imitation in language, If, when, and why. *Cognitive Psychology*, *6*, 380-420.

Bloomfield, L. (1935). *Language*. London: George Allen & Unwin Ltd.

Brackbill, Y., & Little, K. B. (1957). Factors determining the guessing of meanings of foreign words. *Journal of Abnormal Social Psychology*, *54*, 312–318.

Brown, R. W., Black, A. H., & Horowitz, A. E. (1955). Phonetic symbolism in natural languages. *Journal of Abnormal Social Psychology, 50*, 388–393.

Bussmann, H. (1996). Behaviorism. In G. P. Trauth and K. Kazzazi (Trans. and eds.), *Routledge Dictionary of Language and Linguistics* (p. 125). London & New York: Routledge.

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. The Hague, Paris: Mouton.

Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Shinner's Verbal Behavior. *Language, 35(1)*, 26-58.

Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, N. (1971). Deep Structure, surface structure, and semantic interpretarion. In D. D. Steinberg and L. A. Jakobovits (Eds.), *Semantics* (pp. 183-216). Cambridge: Cambridge University Press.

Chomsky, N. (1972). *Language and Mind*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Chomsky, N. (1975). *Reflections on Language*. New York: Pantheon.

Chomsky, N. (1981). *Lectures on government and binding*. Dordrecht: Foris.

Chomsky, N. (1986). *Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use*. New York: Praeger.

Chomsky, N. (1995) *The Minimalist Program*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, N. (2009). *Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought* (3rd edition). Cambridge: Cambridge University Press. (First edition published by Harper & Row 1966).

Cornford, F. M. (1935). *Plato's Theory of Knowledge*. London: Routledge and Kegan Paul.

Creel, S. C., Newport, E. L. & Aslin, R. N. (2004). Distant melodies: Statistical learning of non-adjacent dependencies in tone sequences. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 30*, 1119-1130.

Descartes, R. (1984-85). *The Philosophical Writings of Descartes* (Vol. 1). (J. Cottingham, R. Stoothoff, D. Murdoch, A. Kenny, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.

Descartes, R. (1991). *The Philosophical Writings of Descartes* (Vol. 3). (J. Cottingham, R. Stoothoff, D. Murdoch, A. Kenny, Trans.). Cambridge Cambridge: University Press.

Fillmore, C. J. (1968). The case for case. In E. Bach & R. T. Harms (Eds.). *Universals in linguistic theory* (pp. 1–88). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Fillmore, C. J. (1969). Toward a modern theory of case. In D. A. Reibel & S. A. Schane (Eds.), *Modern studies in English: readings in transformational grammar* (pp. 361–375). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Fodor, J. (1975). *The Language of Thought*. New York: Thomas Y. Crowell Company.

Freudenthal, D., Pine, J. M. & Gobet, F. (2005). Modelling the develpment of children's use of optional infinitives in English and Dutch using MOSAIC. *Cognitive Science*, *30*, 277–310.

Gathercole S. E. Baddeley, A. D. (1989). Evaluation of the role of phonological STM in the development of vocabulary in children, A longitudinal study. *Journal of Memory and Language*, *28*, 200-213.

Gebels, G. (1969). An investigation of phonetic symbolism in different cultures. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, *8*, 310–312.

Gleitman, L. R., & Newport, E. L. (1995). The Invention of Language by Children: Environmental and biological influences on the acquisition of language. In L. R. Gleitman and M. Liberman (Eds.). *An Invitation to Cognitive Science, Vol. 1: Language*. Cambridge, MA: MIT Press.

Gobet, F., Lane, P. C. R., Croker, S., Cheng, P. C. H., Jones, G., Oliver, I. & Pine, J. M. (2001). Chunking mechanisms in human learning. *Trends in Cognitive Sciences*, *5 (6)*, 236-243.

Greenberg, J. H. (Ed.). (1963). *Universals of Language*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Harris, R. & Taylor, T. J. (1989). *Landmarks in Linguistic Thought: The Western Tradition From Socrates to Saussure*. London and New York: Routledge.

Harris, R. A. (1993). *The Linguistic Wars*. New York: Oxford University Presss.

Hauser, M., Newport, E. L., & Aslin, R. N. (2001). Segmentation of the speech stream in a non-human primate: Statistical learning in cotton-top tamarins. *Cognition*, *78*, B41-B52.

Heimann, B. (1937). *Indian and Western Philosophy*. London: George Allen & Unwin LTD.

Herder, J. G. (1966). *Essay on the origin of language*. (J. H. Moran & A. Gode, Eds. & Trans.). Chicago: University of Chicago Press.

Huck, G. J. & Goldsmith, J. A. (1995). *Ideology and Linguistic Theory*. Chicago: University of Chicago Press.

Humboldt, W. V. (1988). *On Language: The Diversity of human Language-structure and its Influence on the Mental Development of Mankind*. (P. Heath, Trans.). Cambridge University Press, Cambridge.

Hume, D. (1978). *A treatise of human nature*. (P. H. Nidditch, Ed.). Oxford: Oxford University Press.

Jackendoff, R. (1997). *The Architecture of the Language Faculty*. Cambridge, MA: MIT Press.

Jones, G., Gobet, F. & Pine, J. M. (2007). Linking working memory and long-term memory: A computational model of the learning of new words. *Developmental Science*, *10*, 853-873.

Kandel E. R., Schwartz, J. H. & Jessell, T. M. (2000). *Principles of Neural Science*. New York: McGraw-Hill.

Katz, J. J. and Fodor, J. A. (1963). The Structure of Semantic Theory. *Language*, *39*, 170-210.

Köhler, W. (1947). *Gestalt psychology, an introduction to new concepts in modern psychology*. New York: Liveright.

Kovic, V., Plunkett, K. & Westermann, G. (2010). The Shape of Words in the Brain. *Cognition*, *114*, 19-28.

Kunihira, S. (1971). Effects of expressive voice on phonetic symbolism. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, *10*, 427–429.

Lakoff, G., and Ross, J. R. (1976). Is Deep Structure Necessary? In J. D. McCawley (Ed.). *Notes from the Linguistic Underground (Syntax and Semantics. 7)*. New York: Academic Press.

Leibniz, G. W. (1949). *New Essays Concerning Human Understanding*. (A. G. Langley, Trans.). La Salle, Illinois: Open Court.

Levine, R. D. and Postal, P. M. (2004). A Corrupted Linguistics. In P. Collier & D. Horowitz (Eds.). *The Anti-Chomsky Reader* (pp. 230-231). New York: Encounter Books.

Locke, J. (1975). *An essay concerning human understanding*. (P. H. Nidditch, Ed.). London: Oxford University Press.

Luria, A. R. & Vygotsky, L. S. (1992). *Ape, primitive man, and child: Essays in the History of Behavior*. (E. Rossiter, Trans.). New York: Harvester Wheatsheaf.

Masur E. F. (1995). Infants' early verbal imitation and their later lexical development. *Merrill-Palmer Quarterly*, *41*, 286-306.

Matilal, B. K. (2001). *The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language*. New Delhi: Oxford University Press.

Matsumoto, D. (2009). (Ed). *The Cambridge Dictionary of Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Miller, G. A. (1977). *Spontaneous apprentices: Children and language*. New York: Seabury Press.

Newmeyer, F. J. (1986a). *Linguistic Theory in America* (2nd Ed.). Orlando, Florida: Academic Press.

Newmeyer, F. J. (1986b). *The Politics of Linguistics*. Chicago: University of Chicago Press.

Newmeyer, F. J. (1996). *Generative Linguistics*. London: Routledge.

Newport, E. L. & Aslin, R. N. (2000). Innately constrained learning: Blending old and new approaches to language acquisition. In S. C. Howell, S. A. Fish, and T. Keith-Lucas (Eds.). *Proceedings of the 24th Annual Boston University Conference on Language Development*. Somerville, MA: Cascadilla Press.

Newport, E. L., & Aslin, R. N. (2004). Learning at a distance: I. Statistical learning of non-adjacent dependencies. *Cognitive Psychology*, *48*, 127-162.

Newport, E. L., Hauser, M. D., Spaepen, G. & Aslin, R. N. (2004). Learning at a distance: II. Statistical learning of non-adjacent dependencies in a non-human primate. *Cognitive Psychology*, *49*, 85-117.

O'Grady, W. (2008). Innateness, universal grammar, and emergentism. *Lingua* , *118 (4)*, 620–631.

Parker, A.R. (2006). *Evolution as a Constraint on Theories of Syntax: The Case Against Minimalism*, Ph. D thesis, School od Philosophy, Psychology and Language Sciences, University of Edinburgh.

Patañjali (1991). *The ŋah□ bh□ṣya of Patañjali: With Annotations*. (S. Dasgupta, Trans.). New Delhi: Indian Council of Philosophical Research.

Piaget, J. (1959). *The Language and Thought of the Child*. (Marjorie & R. Gabain, Trans.). London and New York: Routledge.

Piaget, J. (1995). *Sociological Studies*. (T. Brown, Trans.). London: Routledge.

Piattelli-Palmarini, M. (Ed.). (1983). *Language and Learning: The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky*. New York: Routledge.

Poirier, P. (2006). Behaviorism: Varieties. In *The Encyclopedia of Language and Linguistics* (Vol. 1, p. 714). Amsterdam: Elsevier Ltd.

Plato (1924). *Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus*. (W. R. M. Lamb, Trns.) Cambridge, MA: Harvard University Press.

Plato (1998). *Cratylus*. (C. D. C. Reeve, Trans.). Indianapolis: Hackett.

Ramachandran, V. S. & Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia—A window into perception, thought and language. *Journal of Consciousness Studies*, *8*, 3–34.

Ramscar, M. (2007). Developmental change and the nature of learning in childhood. *Trends in Cognitive Science, 11 (7)*, 274–9.

Reeder, P. A., Newport, E. L., & Aslin, R. N. (2010). Novel words in novel contexts: The role of distributional information in form-class category learning. *Cognitive Science Society, 32*, 2063-2068.

Saffran, J. R., Aslin, R. N. & Newport, E. L. (1996). Statistical learning by 8-month-old infants. *Science, 274 (5294)*, 1926–1928.

Saffran, J. R., Newport, E. L., Aslin, R. N., Tunick, R. A., & Barrueco, S. (1997). Incidental language learning: Listening (and learning) out of the corner of your ear. *Psychological Science, 8*, 101-105.

Sapir, E. (1929). A study in phonetic symbolism. *Journal of Experimental Psychology, 12*, 225–239.

Saussure, F. De (1959). *Course in General Linguistics*. (W. Baskin, Trans.). New York: Philosophical Library.

Scholz, B. C. and Pullum, G. K. (2006). Irrational nativist exuberance. In R. Stainton (Ed.). *Contemporary Debates in Cognitive Science* (pp. 59-80). Oxford: Basil Blackwell.

Searle, J. R. (1972). Chomsky's Revolution in Linguistics. *The New York Review of Books*. http//www.chomsky.info/onchomsky/19720629.htm

Seidenberg, M. S. & McClelland, J. L. (1989). A distributed developmental model of word recognition and naming. *Psychological Review, 96 (4)*, 523–568.

Seuren, P. A. M. (2004). *Chomsky's Minimalism*. Oxford and New York: Oxford University Press.

Seuren, P. A. M. (2006). Aristotle and Linguistics, In *The Encyclopedia of Language and Linguistics* (Vol. 1, p. 555). Amsterdam: Elsevier Ltd.

Singer, D. G. & Revenson, T. A. (1996). *A Piaget Primer: How a Child Thinks*. New York: The Penguin Group.

Skinner B. F. (1938). *The behavior of organisms*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Skinner, B. F. (1957). *Verbal Behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts Inc.

Smith, L., Dockrell, J. & Tomlinson, P. (1997). (Eds.). *Piaget, Vygotsky and beyond*. London and New York: Routledge.

Tomasello, M. (2008). *Origins of Human communication*. Cambridge, MA: MIT Press.

Tsiapera M. & Wheeler G. (1993). *The Port-Royal grammar: sources and influences*. Muster: Nodus Publikationen.

Vygotsky, L. (1962). *Thought and Language*. (E. Hanfmann & G. Vakar, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.

Wertheimer, M. (1958). The relation between the sound of a word and its meaning. *The American Journal of Psychology*, *71*, 412–415.

Whorf, B. L. (1956). *Language, thought, and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf*. (J. B. Carroll, ed.). Cambridge, MA: MIT Press.

Wittgenstein, L. (2001). *Philosophical Investigations* (3rd ed.). (G. E. M. Anscombe, Trans.). Cambridge, MA: Blackwell Publishing.

সিলেট জেলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা: একটি সমীক্ষা

অধ্যাপক ড.আ.ক.ম. মাহবুবুজ্জামান*

Abstract

The fishermen community is one of the oldest communities in Bangladesh. They are living on the banks of various rivers, haors, baors, beels, canals, lakes and the coasts of the Bay of Bengal. As occupation of this community nurtures and captures fishes, and supplies those to the local and national markets. A good number of the local people depend on this occupation for their livelihood and they are known as 'Fishermen Community'. Nowadays there are no free areas for fishing and, by rules of the government; they have to take lease for fishing. Sylhet district is rich by its haors, beels, canals, lakes and rivers. Many fishermen villages are situated in this district. Eight villages have been selected from Tuker Bazar Union of Sylhet Sadar Upazila for studying the present socio-economic conditions of the fishermen community. People within this community are relatively poor, hard working and painstaking. Paucity of getting natural fish in above mentioned sources is considered a great problem nowadays. They have no capital to take lease of fishing sources by their own and they are afraid of loosing their credited money to invest in them. Therefore many of them are withdrawing themselves from their fishing occupation and migrating in other occupations like fish selling, vegetables sellings, operating grossery shops, small vehicles driving, creating nurseries, receiving jobs in various offices and factories, etc. This type of migration is now causing extinction from their community occupation. Fishermen of two villages of the study area have already quitted their occupation and many people of other villages also quiting slowly. This denotes their deplorable condition of combating to stay on their own occupation. The policy makers should consider the facts revealed in this study.

---

* অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রারম্ভ

মৎস্য আহরণ একটি অতি প্রাচীন পেশা। অনেকে এ পেশাটিকে আদিম পেশাগুলোর মধ্যেকার একটি বলেও অভিহিত করে থাকেন। এটি প্রায় বন্য পশু শিকারের যুগের একটি পেশা হিসেবে পরিগণিত। পেশাটির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলোকে সাধু বাংলায় 'মৎস্যজীবী' বলা হলেও চলিত বাংলায় তারা 'জেলে' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ২০০৯ সালে প্রকাশিত "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯" অনুসারে জেলে বা মৎস্যজীবীকে এই রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন (ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯)।"

যে কোন কারণেই হোক না কেন এই সম্প্রদায়টি চিরকালই অবহেলিত ছিল। এর মূল কারণ ছিল মৎস্য আহরণকারীদের জীবন যাপন পদ্ধতি। জলাশয়ে (নদী, খাল, বিল, হাওর, সাগর, দিঘি, পুকুর প্রভৃতি) মাছ ধরার ক্ষেত্রে তাদের সময়ের কোন বাছ-বিচার থাকে না। দিনের ও রাতের যে কোন অংশেই তাদের মৎস্য আহরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ফলে খাবার গ্রহণের নির্ধারিত সময় তাদের থাকে না। তাদের কাপড়-চোপড় প্রায়শই ভেজা থাকে। আর সারা শরীর ও কাপড় চোপড়ে থাকে মাছের আঁশটে গন্ধ। সেই গন্ধ শুকিয়ে গিয়ে উৎকট গন্ধে পরিণত হয়। তাছাড়া, তাদের সারা বাড়ি জুড়ে থাকে মাছের আঁশটে গন্ধ আর মরা ও শুটকি মাছের পুঁতি গন্ধ। ফলে প্রাচীনকাল থেকেই মৎসজীবীরা পল্লী গ্রামের এক প্রান্তে থাকতো অথবা পৃথক গ্রামে তাদের বসবাস করতে হতো। কালক্রমে তাদেরকে পৃথক একটি সমাজ বা গোষ্ঠি হিসেবে চিহ্নিত করা হতে থাকে। বাংলা ভাষার বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে 'জেলে পল্লী' নামে তাদের পৃথক গোষ্ঠি হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

জেলেদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয়ই আছে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের জেলের সংখ্যাই বেশি। যদিও ভারতবর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জেলে সম্প্রদায়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। যেহেতু তারা পৃথক গোষ্ঠি হিসেবে বহুদিন থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে, তাই হিন্দু ধর্মের বর্ণ বিন্যাসে তারা 'শূদ্র' বর্ণে এবং ইসলাম ধর্মের শ্রেণি বিন্যাসে তারা 'আতরাফ' শ্রেণি (যেটি এখন আর তেমন প্রচলিত নাই, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর ফারায়েজী আন্দোলনের পরে তা ক্রমশ অকার্যকর) হিসেবে বিবেচিত ছিল। এখন ইসলাম ধর্মে আতরাফ শ্রেণি কার্যকর না থাকলেও জেলেদের বিয়ে ও অন্যান্য সামাজিক কার্যাবলী অদ্যাবধি কেবল তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রাচীন কাল থেকে 'মাছে ভাতে বাঙ্গালি' বলে যে প্রবাদ এ দেশে বিদ্যমান, সেই মাছের যোগান আসতো এই সম্প্রদায়ের নিকট থেকেই।

মোগল বা নবাবী আমলে তো বটেই, বৃটিশ আমলেও তাদের মৎস্য আহরণ ছিল অবারিত। যে জেলে যে অঞ্চলে বাস করে, সেই অঞ্চলের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওরে তাদের মৎস্য আহরণে কেউ বাদ সাধতো না। ফলে তাদের জীবন যাপনে অভাব অনটন তেমন তীব্র হয়ে কখনও দেখা দেয়নি। পাকিস্তান আমলে জেলেদেরকে নিবন্ধিত করা হয় এবং তালিকাভুক্তদের জন্য বিভিন্ন নদ-নদী ও খাল-বিলে কিছু টাকার বিনিময়ে বার্ষিক ইজারা প্রথা চালু করা হয়। সেই প্রথাতেও তাদের তেমন একটা সমস্যা হয়নি। তারা নাম নথিভুক্ত করে কিছু টাকার বিনিময়ে ইজারা নিয়ে গোষ্ঠিগতভাবে মাছ ধরতো। তাতে তাদের আয় কিছু কমলেও অনটন হতো না। জেলে সম্প্রদায়ের লোকদের প্রধান পেশা চিরকালই মাছ ধরা ছিল, তবে খুব সামান্য

কিছু জমি তারা চাষ করতো। এই জমি হয় তাদের নিজস্ব মালিকানাভুক্ত ছিল, অথবা তারা অন্যের জমি নিয়ে বর্গা চাষ করতো। গ্রীষ্মকালে মাছ ধরার কাজটি বন্ধ থাকতো, তখন তারা কৃষি কাজ বা জাল বোনার কাজ করতো। সেই ফসল বা ঘরে তৈরি জাল হাট বাজারে বিক্রি করে তাদের সংসার চালাতো। বলতে গেলে গ্রীষ্মকালটাই ছিল তাদের অনটনের কাল। বাংলাদেশ আমলের প্রথম দিকে তাদের মাছ ধরতে বা জলাশয়ে মাছ পেতে তেমন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পরে গঙ্গা/পদ্মা ও তার শাখা নদীসমূহে মাছের আকাল দেখা দেয়। ফলে বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি এলাকার জেলেরা নদীতে বা উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ তেমন একটা পেতো না। তখন তারা হাওর, বাওর, দিঘি, বিল প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু কৃষি জমিতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে হাওর, বাওর, দিঘি ও বিলে মাছের আকাল তীব্রতর হয়ে ওঠে। ক্রালক্রমে বাংলাদেশের প্রায় সকল নদীতেই মাছের আকাল পরিলক্ষিত হতে থাকে। ফলে জেলে পল্লীগুলোতে হাহাকার শুরু হয় জীবিকার অভাবে।

এর সঙ্গে নতুন আরেকটি উপসর্গ যোগ হয়। প্রতাপশালী কিছু গোষ্ঠি 'মৎস্যজীবী' নামে তাদের সমিতি তালিকাভুক্ত করে বেশি টাকা দিয়ে জলাশয়সমূহ ইজারা নেয়া শুরু করে। প্রত্যক্ষ টেন্ডারে তাদের প্রদত্ত দরের কাছে জেলে সম্প্রদায় আর লিজ নেবার সুযোগ পায় না। এই স্বার্থান্বেষী মহল এতই শক্তিশালী যে, অসংগঠিত জেলে সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে টাকার খেলায় পরাজিত হতে বাধ্য হয়। দু'চারটি এলাকায় জেলে সম্প্রদায় সংগঠিত হয়ে কিছু জলাশয় লিজ নিতে সক্ষম হলেও নতুন উৎপাত আসে চাঁদাবাজির। সেই জ্বালাতন সহ্য করে তাদের যা আয় হয়, তাতে সংসার চালানো সম্ভবপর হয় না। একান্ত বাধ্য হয়েই তারা পেশা পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, জেলে পল্লী নামে থাকলেও সত্যিকার জেলে সম্প্রদায়কে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে এখন রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রভৃতি পেশায় রূপান্তরিত জেলে ব্যক্তি ও পরিবারকে দেখতে পাওয়া যায়।

সিলেট জেলায় সুরমা-কুশিয়ারা নদীসহ অসংখ্য হাওর, বিল, খাল ও দিঘি এখনও বিদ্যমান। এই এলাকায় প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নে দশ-বিশটি জেলে পল্লী ছিল। যেগুলোর অনেকগুলো এখন নামেই কেবল জেলে পল্লী। নামমাত্র কিছু লোক এখন এই পেশাটির সঙ্গে জড়িত আছে, তারাও অনেকটা মৌসুমী জেলে। বছরের বেশির ভাগ সময় তারা দ্বিতীয় পেশা বা পরিবর্তিত পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে 'টুকের বাজার' নামে একটি ইউনিয়ন রয়েছে, যার ৮টি গ্রাম ছিল জেলে পল্লী। সর্বশেষ ২০১১ সালে সেই গ্রামগুলোতে মোট ২৪৭টি জেলে পরিবার বাস করতো (হোসেন, ২০১১)। এখন ২টি গ্রামে কোন পরিবারই জেলে হিসেবে আর নাই, সকলেই পরিবর্তিত পেশায় চলে গেছে, তবে জেলে সম্প্রদায় তাদেরকে নিজেদের লোক বলে দাবি করে। বাকি গ্রামগুলোর প্রায় শতকরা ৫০ভাগ জেলে পরিবার বর্তমানে পরিবর্তিত পেশায় চলে গেছে। যারা এখনও জেলে পরিচয়ে রয়েছে, তাদের দ্বিতীয় পেশাটি ক্রমশ প্রথম পেশার স্থান দখল করার পথে রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি

১. জেলে পরিবারগুলোর বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা
২. তাদের পেশা পরিবর্তনের কারণসমূহ উদ্ঘাটন করা

৩. গৃহীত পেশাসমূহ ও তাদের বর্তমান আয় সম্পর্কে অবগত হওয়া
৪. যারা এখনও জেলে পেশায় রয়েছে, তাদের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করা

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি একটি উদ্ঘাটনমূলক গবেষণা। সিলেট জেলার সদর উপজেলার টুকের বাজার ইউনিয়নের ৮টি গ্রামের উপর এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। গ্রামগুলোর নাম হচ্ছে, শেখপাড়া, চরুগাঁও, সাহেবেরগাঁও, হায়দারপুর, পীরপুর, শাহপুর, টুকেরগাঁও/ঘোপাল ও গৌরিপুর। এই গ্রামগুলোতে প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম ও হিন্দু জেলে সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। বর্তমানে জেলে পরিবারগুলো সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গেছে। ৮টি গ্রামের মধ্যে প্রাচীন জেলে পল্লী পীরপুর ও শাহপুরে পূর্বকালে যারা জেলে ছিল, তারা সকলেই পরিবর্তিত পেশায় চলে গেছে। বর্তমানে কোন পরিবারই এখন আর মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত নেই। অন্যান্য গ্রামগুলোতেও পেশার পরিবর্তন দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অনুসূচিসহ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফ জি ডি) ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বমোট ৮ টি গ্রামের ২৪৭টি জেলে পরিবার থেকে প্রতি গ্রামে ১০টি করে দৈবচয়িতভাবে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে মোট ৮০টি জেলে পরিবারকে নিয়ে এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, যারা গবেষণা বিষয়ে কোর্স সম্পন্ন করেছে। গবেষক নিজে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পদ্ধতিতে উপস্থিত থেকেছেন এবং উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি তত্ত্বাবধান করেছেন। উত্তরদাতাদের ঘর-বাড়ি, পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসা সুবিধা ও গ্রহণ পদ্ধতি এবং সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সিলেট জেলার সদর উপজেলার একটি মানচিত্র এখানে সংযুক্ত করা হলো, যেখানে সমীক্ষীত এলাকাসমূহ সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে:

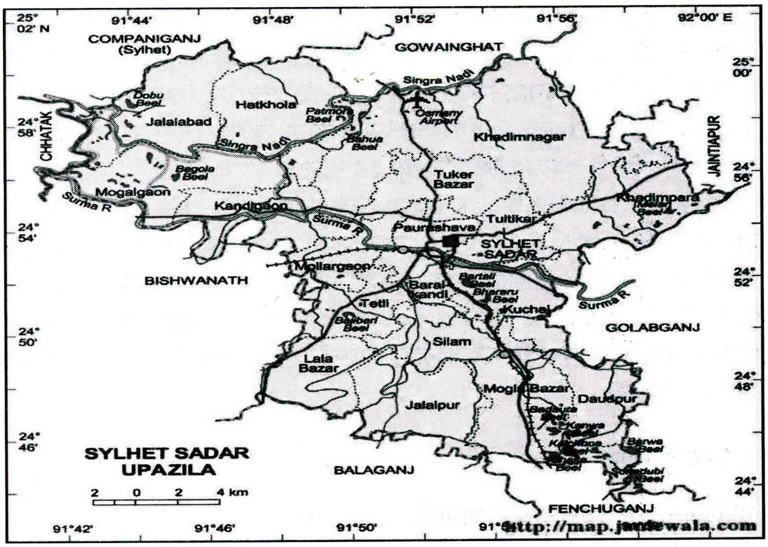

প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

১. আর্থ-সামাজিক অবস্থা

১.১ পরিবার সংখ্যা ও বয়সসহ মোট জনসংখ্যা

পর্যবেক্ষিত মোট ৮টি গ্রামের প্রাচীন জেলে পরিবারের সংখ্যা ২৪৭টি। তাদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ৪৩৭ জন। তার মধ্যে কিছু পরিবার এখন আর মৎস্য আহরণ পেশায় রত নেই। তবু তাদেরকে পূর্বতন পেশা ও বংশগত কারণে 'জেলে' হিসেবে সকলেই অভিহিত করে থাকেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি গ্রামেই জেলে পরিবারগুলো এখন সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। গ্রামগুলোতে অবস্থানরত বাকি পরিবারগুলোর অধিকাংশই অবস্থা সম্পন্ন মুসলিম আর সামান্য কিছু মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার রয়েছে। মোট ৮০টি নমুনা পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৪৬, যা জাতীয় পারিবারিক সদস্যদের গড় হার (৪.৬০) থেকে বেশি। সম্ভবত শিক্ষার হার কম থাকায় তাদের মধ্যে ছোট পরিবার গঠনের ধারণাটি তেমন একটা গড়ে ওঠেনি। অনূর্ধ্ব ৯ বছর বয়স্ক শিশুদের সংখ্যাই পরিবারগুলোতে বেশি (২৩.৮০%)। আরও উল্লেখ্য, তাদের ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী লোকের সংখ্যা জাতীয় হারের চেয়ে কম, প্রায় ৮ শতাংশ। সারণি নং ১.১-এ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা দেখানো হয়েছে:

সারনি ১.১ নারী ও পুরুষ ভেদে পরিবারের সদস্যসংখ্যা

বয়স (বছর)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট	শতকরা
অনূর্ধ্ব ০৪	৩৩	২৭	৬০	১৩.৭৩
০৫-০৯	২১	২৩	৪৪	১০.০৭
১০-১৪	১৮	১৪	৩২	৭.৩২
১৫-১৯	১৭	২২	৩৯	৮.৯৩
২০-২৪	১৮	২৩	৪১	৯.৩৮
২৫-২৯	২০	১৩	৩৩	৭.৫৫
৩০-৩৪	১২	১৫	২৭	৬.১৮
৩৫-৩৯	১৭	১৪	৩১	৭.০৯
৪০-৪৪	১৩	১২	২৫	৫.৭২
৪৫-৪৯	১৪	১১	২৫	৫.৭২
৫০-৫৪	১১	০৯	২০	৪.৫৮
৫৫-৫৯	১১	১৫	২৬	৫.৯৫
৬০-৬৪	৯	৭	১৬	৩.৬৬
৬৫ ও তদূর্ধ্ব	৭	১১	১৮	৪.১২
মোট			৪৩৭	১০০.০০

(মাঠ পর্যায় থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সংগৃহীত উপাত্ত) (পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৪৬ জন)

১.২ প্রধান ও অ-প্রধান পেশা

অধিকাংশ জেলে পরিবার তাদের প্রধান পেশা মৎস্য আহরণ বর্জন করে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। নদী, বিল, হাওর, খাল, কোথাও তাদের আর স্বাধীন ও বিনা পয়সায় মাছ ধরার সুযোগ না থাকায় তারা অনেকটা বাধ্য হয়েই পূর্ব পুরুষের পেশা পরিত্যাগ করে নতুন নতুন পেশায় জড়িত হচ্ছে। ২০০৯ সালে জারিকৃত 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯' এর ধারা ২(খ)-এ বর্ণিত আছে যে, "প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল-ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না (ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯)।"

কিন্তু বাস্তবে জেলে পরিবারগুলো তার বাস্তবায়ন দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, প্রকৃত মৎস্যজীবী না হয়েও কিছু সমিতি প্রভাবশালীদের আশীর্বাদে ইজারায় (লিজ) অংশগ্রহণ করতে পারছে, আর তারা ইজারাও পেয়ে যাচ্ছে। আবার যে সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত জেলেরা লিজ নিতে পারছে, সেখানেও অ-প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিগুলো প্রকৃত জেলেদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে অথবা সামান্য লাভ দিয়ে জলমহালগুলো কিনে নিচ্ছে। প্রকৃত জেলেরা প্রাণের ভয়ে জলমহাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরে মাছ ধরার কাজ না পেয়ে জেলেরা তাদের প্রাচীন পেশা ত্যাগ করে নতুন নতুন পেশা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করছে (হোসেন, ২০১১)। ৮০টি নমুনা পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩৭টি পরিবারের বর্তমান প্রধান পেশা মাছ ধরা। বাকী ৫৩টি পরিবারের মধ্যে ১১টি পরিবার পুরোপুরিভাবে মাছ ধরা পেশা পরিত্যাগ করেছে। ৩২টি পরিবার মাছ ধরাকে তাদের অ-প্রধান পেশা হিসেবে গণ্য করেছে। নমুনা জেলে পরিবারসমূহের মতানুসারে প্রতি বছরই ঝরে যাচ্ছে মাছ ধরা পেশার লোকজন আর গ্রহণ করছে নতুন নতুন পেশা। নতুন পেশায় তাদের গমন প্রক্রিয়া ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা তাদের পেশায় আর অবস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে না বা তাদের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হচ্ছে না। আরও উল্লেখযোগ্য, তারা কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে তেমন আগ্রহী হচ্ছে না, বরঞ্চ শাক-সবজি বিক্রি, মাছ কিনে বিক্রি করা ও নার্সারি করা প্রভৃতি পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে। সারনি ১.২ এ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে:

সারনি ১.২: জেলে পরিবারগুলোর সদস্যদের প্রধান ও অ-প্রধান পেশা

প্রধান পেশার নাম	সদস্য সংখ্যা	শতকরা	অ-প্রধান পেশার নাম	সদস্য সংখ্যা	শতকরা
শিশু (অনূর্ধ্ব ৪ বছর)	৬০	১৩.৭৩	শিশু (অনূর্ধ্ব ৪ বছর)	৬০	১৩.৭৩
ছাত্র	৬৭	১৫.৩৩	ছাত্র	৬৭	১৫.৩৩
মাছ ধরা	৩৭	৮.৪৭	মাছ ধরা	৪৩	৯.৮৪
মাছ বিক্রি	৩১	৭.০৯	মাছ বিক্রি	৪৯	১১.২১
কৃষি কাজ	৯	২.০৬	কৃষি কাজ	২১	৪.৮১
শাক সবজি বিক্রি	৫৭	১৩.০৪	শাক সবজি বিক্রি	৬৪	১৪.৬৫
রিক্সা/ভ্যান চালানো	২১	৪.৮১	রিক্সা/ভ্যান চালানো	২৫	৫.৭২
স্কুটার/অটোরিক্সা চালানো	০৭	১.৬০	স্কুটার/অটোরিক্সা চালানো	০০	০০
বাসের হেলপার	১৩	২.৯৭	বাসের হেলপার	০০	০০
মুদি দোকানদারি	২৮	৬.৪১	মুদি দোকানদারি	০০	০০
মেকানিক	১১	২.৫২	মেকানিক	০০	০০
নার্সারি	৪৯	১১.২২	নার্সারি	৭৫	১৭.১৫
মিনতিগিরি	১৩	২.৯৭	মিনতিগিরি	২১	৪.৮১
গার্ড পদে চাকরি	০৭	১.৬০	গার্ড পদে চাকরি	০০	০০
বিদেশে চাকরি	১৫	৩.৪৩	বিদেশে চাকরি	০০	০০
বেকার	১২	২.৭৫	বেকার	১২	২.৭৫
মোট	৪৩৭	১০০.০০	মোট	৪৩৭	১০০.০০

(মাঠ পর্যায় থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সংগৃহীত উপাত্ত)

১.৩ জেলে পরিবারগুলোর শিক্ষার হার

মোট ৮০টি জেলে পরিবারের ৪৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন এস.এস.সি পাস সদস্য রয়েছে। বাকিদের মধ্যে ৮ম শ্রেণি পাস ১২ জন, প্রাথমিক পর্যায় পাস ৮০ জন, প্রাথমিকের নিচে রয়েছে ৬৭ জন। তাদের গড় শিক্ষার হার শতকরা ৩২.৩০ ভাগ, যা জাতীয় শিক্ষা হারের প্রায় অর্ধেক। শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা লক্ষণীয়। কারণ, খুব নিকটেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকলেও তাদের শিক্ষার হার যথেষ্ট কম।

১.৪ জেলে পরিবারগুলোর মাসিক আয়

জেলে পরিবারগুলো আর্থিক দিক থেকে বেশ শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। তাদের মাসিক গড় পারিবারিক আয় ৪,৫৬২.৫০ টাকা। তার মধ্যে শতকরা ৪৪ টি পরিবারের মাসিক আয় ৩০০০ টাকা বা তার চেয়ে কম। এই ক্ষুদ্র আয় ৫.৪৬ জন (গড় পারিবারিক সদস্য) সদস্যের একটি পরিবারের জন্য বর্তমান বাজার মূল্যে খুবই অপ্রতুল। একটি পরিবার পরিচালনায় ৩ বেলা খাবার জোটানোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া, ঐ আয় শ্রেণির পরিবারগুলোর পক্ষে তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করাও বেশ কঠিন। ফলে, তাদের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। তাদের সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থায় মিনতিগিরি, মাছ বিক্রি, শাক সবজি বিক্রি বা মেকানিকের মত কাজে নিয়োজিত হতে হচ্ছে। তাদের সদস্যদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার মত স্বচ্ছলতা তারা অর্জন করতে পারছে না। সারনি নং ১.৩ এ পারিবারিক আয়ের চিত্র দেখা যেতে পারে।

সারনি ১.৩ জেলে পারিবারের মাসিক আয়

মাসিক পারিবারিক আয়	জেলে পরিবার	শতকরা
অনূর্ধ্ব ৩,০০০ টাকা	৩৫	৪৩.৭৫
৩০০১- ৫০০০ টাকা	১৯	২৩.৭৫
৫০০১-৭০০০ টাকা	১৪	১৭.৫০
৭০০১-৯০০০ টাকা	১০	১২.৫০
৯০০১-১১০০ টাকা	০২	০২.৫০
মোট	৮০	১০০.০০

(মাঠ পর্যায় থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সংগৃহীত উপাত্ত)

১.৫ জেলে পল্লীগুলোর ঘর-বাড়ির ধরন

জেলে পল্লীগুলো প্রধানত দরিদ্র পল্লী, তারা কোন রকমে দিনাতিপাত করছে। তাই তাদের অধিকাংশের ঘর-বাড়ি বাঁশ-খড়, শক্ত ঘাস দিয়ে তৈরি। তবে বর্তমানে বাঁশ ও খড়ের দুর্মূল্যের কারণে অনেকে ঋণ করে টিনের তৈরি বাড়ি বানিয়েছে, কেউ কেউ ইট দিয়ে দেয়াল করে উপরে টিনের ছাউনি দিয়েছে। ৮০টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৬টি পরিবারের দালান ও ঘরের ছাদ ঢালাই অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাদের ৪ জন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রি করে পাকা বাড়ি করেছে, আর ২ জন বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ করে পাকা ছাদ তৈরি করেছে। নিজের মাছ ধরা পেশা বা অন্য কোন পেশা থেকে এখনও তাদের পাকা বাড়ি তৈরি করার মত সংগতি জন্মায়নি।

১.৬ জেলে পরিবারগুলোর চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তি

প্রাচীন কাল থেকে জেলে পরিবারগুলো অসুখ বিসুখে গ্রামীণ প্রচলিত টোটকা চিকিৎসা ও তেল/পানি পড়া প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে তার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটেছে। কয়েকটি এনজিও তাদের স্বল্প ব্যয়ের চিকিৎসা ক্লিনিক খুলেছে পার্শ্ববর্তী তেমুখী মোড়ের কাছে ও টুকের বাজার এলাকায়। যেমন, সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এসএসকেএস) এর 'সূর্যের হাসি ক্লিনিক', সীমান্তিকের 'বর্ণমালা' ক্লিনিক প্রভৃতি। এসব ক্লিনিকের সদস্য হতে হয় ২০ টাকা দিয়ে। তার পরে যেকোন অসুখের চিকিৎসায় (অপারেশনাল চিকিৎসা ব্যতীত) ১০ টাকা ফি দিয়ে তারা চিকিৎসা ও কম মূল্যে বা বিনা মূল্যে ওষুধ পেয়ে থাকে। সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন 'ধাত্রী ব্যবস্থা' বা আত্মীয় স্বজনের সেবা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রসবোত্তরকালে মারাত্মক কোন সমস্যা হলে সিলেট শহরের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায় অথবা বাড়িতে রেখে অর্ধ চিকিৎসায় ভুগতে থাকে বহুদিন। জেলে পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা এখনও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণকে বিলাসিতা হিসেবে গণ্য করে থাকে।

১.৭ জেলে পরিবারগুলোর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ

জেলে পরিবারগুলো সুরমা নদীর তীর ঘেসে গড়ে উঠেছিল। এই স্থানগুলোর অনেক জমিই ছিল নদী তীরের সরকারি খাস জমি। পরে তাদের অনেকেই নিজেরা সামান্য কিছু পরিমাণে জমি ক্রয় করে ঘর বাড়ি বেঁধেছিল। তবে বর্তমান প্রজন্মের লোকেরা জানালো যে, শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে কেনা জমিগুলো তাদের পিতা বা প্রপিতামহের আমলের। তারা কোন জমি ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি। এইসব জমি দিয়ে লোকালয়ের বর্ষার পানি নদীতে নামতো। এখন নদী তীরের কতিপয় এলাকায় বাঁধ দেয়া হয়েছে। ফলে বর্ষার সময় (সিলেট জেলায় বর্ষা মওসুম চলে কম

পক্ষে ৬ মাস) তাদের বাড়িঘরের পাশে পানি জমে যায়। অন্তত ১৭টি পরিবারের বাড়িতে বর্ষা মওসুমে পানি ওঠে। তখন তাদের কষ্টের আর সীমা থাকে না। সারা বছরই দেখা যায় স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। বড়ই অস্বাস্থ্যকর। এরই মাঝে তাদের শিশুরা বড় হচ্ছে। তারা পানীয় জলের ক্ষেত্রে সুরমা নদীর পানিকেই ব্যবহার করে এসেছে এতকাল ধরে। বর্তমানেও রান্নাসহ অন্যান্য কাজে নদীর পানি ব্যবহার করে। তবে টিউবওয়েলের পানি পান করার অভ্যাস অনেকটা গড়ে উঠেছে। তাদেরকে খোলা মাঠের পরিবর্তে বেড়া দিয়ে ঘেরা পায়খানা ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে আসছে স্থানীয় এনজিওগুলো। এখন তার ফলে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে বেড়া ঘেরা পায়খানা দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো স্যানিটারি পায়খানা নয়। ফলে সর্বত্রই বোঁটকা গন্ধ ভেসে আসে। বর্ষাকালে সেগুলো উপচে পড়ে আর সর্বত্রই সৃষ্টি হয় দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি।

১.৭ জেলে পরিবারগুলোর চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম

তাদের চিত্ত বিনোদনের প্রাচীন পদ্ধতি ছিল বর্ষাকালে বিভিন্ন দলের জারি, সারি প্রভৃতি গান শোনা, যেগুলোর গায়করা নৌকায় করে নদী তীরে আসতো। সিলেট এলাকায় দলীয় গান হয় বটে, তবে তা জারি গান নয়, বাউল ও ধামালি গান। আসতো হাসন রাজা, শাহ আব্দুল করিম, রাধারমণের গান নিয়ে বিভিন্ন দল। শীতকালে প্যান্ডেল সাজিয়ে চলতো গান। এরা সবাই কম বেশি চাঁদা দিতো। উপঢৌকন হিসেবে কাপড় ও সাংসারিক বস্তু দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এখন আয় কমে যাওয়ায় তারা আর চাঁদা বা উপহার দিতে পারে না। গায়কের দলও আর আসে না। ফলে গ্রামের কোন বাড়িতে থাকা টেলিভিশনই এখন বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে। গ্রামে কয়েকটি দোকান রয়েছে মুদিখানা কাম চা'য়ের দোকান। সারাদিন সেগুলোতে চালু রয়েছে টেলিভিশন, ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে তা উপভোগ করছে। সন্ধ্যার পরে মহিলারা দল বেঁধে টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এখন এটিই তাদের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপকরণ।

১.৮ বিবাহের বয়স ও পাত্র বাছাই পদ্ধতি

বিবাহের বয়সের হিসাব এদের ক্ষেত্রে মেয়ে ‘ডাঙ্গর’ (ঋতুবতী) হওয়া। দলীয় আলোচনায় জানা গেল, ১৩ বছরেই মেয়েরা ডাঙ্গর হয়ে যায় এবং তারা মেয়েদের বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করে ফেলে। ১৫ বছরের বেশি বয়সী কোন অবিবাহিতা মেয়ে জেলে পল্লীগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাত্র নির্বাচনের প্রধান শর্ত হলো যে, সে কোন জেলে পরিবারের সন্তান হবে। হতে পারে তার বর্তমান পেশা মাছ ধরা নয়, কিন্তু পূর্ব পুরুষ জেলে ছিল। এর প্রধান কারণ হলো মুসলিম সমাজের সেই প্রাচীন আতরাফ শ্রেণি প্রথা, যা এখন প্রায় বিলুপ্ত, কিন্তু তার জের এখনও রয়ে গেছে। তখন জেলেদেরকে ছোট জাত (আতরাফ) বলে গণ্য করা হতো। তখন একজন সাধারণ মুসলিম প্রতিবেশি পরিবারের বিয়েতেও জেলে পরিবারকে দাওয়াত করা হতো না। সেই ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে বর্তমান প্রজন্মও। ফলে তারা জেলে পরিবার ছাড়া পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে না। সামাজিক ভেদাভেদের (পদবিন্যাস বা স্ট্রাটিফিকেশন) নমুনা মুসলিম ও হিন্দু জেলে পরিবারগুলো এখনও বহন করে চলেছে।

২. পেশা পরিবর্তনের কারণ

পেশা পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উত্তরদাতাবৃন্দ ৫টি কারণকে প্রধান বলে চিহ্নিত করেছেন।

সেগুলো হলো:

১. নদী, বিল, হাওর, খাল বা অন্যান্য স্থানে মাছের আকাল/পর্যাপ্ত মাছ না পাওয়া।

২. অধিকাংশ জলমহাল ভুয়া জেলেদের সমিতি কর্তৃক লিজ প্রাপ্তি।

৩. যে সব জলমহাল কোনভাবে জেলেরা লিজ পায়, সেগুলোতে চাঁদাবাজ/মাস্তানদের উৎপাত, যাতে তাদের লাভ থাকছে না অথবা লাভ অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণে থাকছে।

৪. লিজের অংক এত বেড়ে গেছে যে, তাদের সমিতিগুলো ঋণ করেও সেগুলো লিজ নিতে পারছে না।

৫. তাদের নিজস্ব পুঁজির প্রকট অভাব।

তবে তাদের সঙ্গে একান্তে আলাপ করে কিছু পরোক্ষ কারণ জানা গেছে, যা তারা প্রকাশ করতে নারাজ। সেগুলোকেই প্রকৃত কারণ হিসেবে গণ্য করা যায়। তাদের গোপন করে যাওয়া কারণগুলো নিম্নরূপ:

ক) দরিদ্র ও অসংগঠিত শ্রেণি হিসেবে জেলেদের উপর রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদের, পুলিশের ও স্থানীয় মাস্তানদের তান্ডব অনেক বেড়ে গেছে। তারা একটি বড় মাছ পেলেই ঐ সব শ্রেণির ব্যক্তিরা বিনা পয়সায় বা অল্প পয়সায় সেগুলো নিয়ে যায়।

খ) তাদের একটি নীরব অভিমান কাজ করছে যে, বাপ-দাদারা সকল জলাশয়ে যেখানে খুশি বিনা লিজে মাছ ধরার সুযোগ পেতো, আজ সে সুযোগ অনেকাংশেই প্রায় বন্ধ। ‘জাল যার, জলা তার’ এই নীতিটি আজ কাগজে কলমে কার্যকর থাকলেও বাস্তবে তা তেমন কার্যকর না থাকায় তাদেরকে ‘নিজ ভূমে পরবাসী’ হতে হয়েছে। সুতরাং এই পেশাতে আর থাকা উচিত নয়।

গ) শহরের উপকণ্ঠে তাদের পল্লী হওয়ায় অনেক প্রভাবশালী ও মাস্তানদের নজর পড়েছে তাদের জমির প্রতি। তারা বিভিন্নভাবে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে, যেন জেলেরা স্বল্প মূল্যে তাদের ভিটা মাটি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যায়। আশে-পাশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেও এর সত্যতা পাওয়া গেছে।

ঘ) মাছ ধরা একটি কষ্টকর ও ধৈর্য্য পরীক্ষার পেশা। বড় জাল ফেলে আধা ঘণ্টা/এক ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। তারপরে হয়তো মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজে নৌকা বেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভোর রাতে ক্ষুধার্ত পেটে বাড়ি ফিরতে হয়। আবার প্রাপ্ত মাছ মরে যাবে বলে না ঘুমিয়ে দূরের বাজারে হেঁটে বা ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে মাছ বিক্রি করে আসতে হয়। এতে খাওয়ার সময় ঠিক রাখা যায় না, ঘুমানোর সময়ও ঠিকমত পাওয়া যায় না। রোদে পুড়ে পানিতে ভিজে এই পেশাটি বহাল রাখতে হয়। তাদের এ যুগের সন্তানদের মধ্যে এত কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা নাই। তারা একটি স্কুটার নিয়ে ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করলে ৫০০ টাকা অনায়াসে রোজগার করতে পারে। তাই তাদের মধ্যে অলসতা প্রবেশ করেছে, আর ভোগ বিলাস ও আয়াসের জীবনের মোহ এসে গেছে। তাই তারা জেলেগিরি পেশা পরিত্যাগ করে অন্য পেশায়, এমনকি বাপ দাদার ভিটা বিক্রি করে বিদেশ চলে যাচ্ছে।

এতগুলো কারণ থাকার পরেও তাদের মতামত, কারণ যতই থাকুক, পূর্বের মত নির্বিঘ্নে ও লিজ ছাড়া বিনা পয়সায় মাছ ধরার সুযোগ পেলে অনেকেই এই পেশায় অবস্থান করতো (এটি তাদের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় জানা গেছে)।

৩. নব গৃহীত পেশাসমূহ ও তাদের বর্তমান আয়

বর্তমানে জেলে পল্লীর সদস্যরা নতুন নতুন পেশার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাদের পুরোনো ও চৌদ্দ পুরুষের পেশা তাদেরকে আর ধরে রাখতে পারছে না। নদী তীরে বাড়ি হলেও নদীর পানিকে আর তাদের বৈঠার আঘাত খুব বেশি সহ্য করতে হচ্ছে না। তারা যেন অভিমান করে জলাশয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে। চলে যাচ্ছে সেই সব পেশায়, যে গুলোতে এতোটা শারীরিক পরিশ্রম নেই, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করা যায়, লোকসানের ঝুঁকি খুবই কম- নেই বললেই চলে, মাস্তানী-চাঁদাবাজদেরকে তোয়াজ করতে হয়না।

পেশা পরিবর্তনের মূলধন জোগাচ্ছে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওসমূহ। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প থেকে আসছে মূলধন। সামান্য কয়েকজন ওয়ারিশি সূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রি করে নতুন পেশার মূলধন গঠন করেছে। পূর্বে বাবার আমলে নদী তীরের যেসব জমির মূল্য খুবই কম ছিল, সেগুলো উপ-শহর হয়ে যাওয়ায় মূল্য বেড়েছে কয়েক শত গুণ। তাই সামান্য কিছুটা বিক্রি করেই চলে আসছে অনেক টাকা। শহরায়নের সূত্র অনুসারে অনেকে তাই সে সব জমি বিক্রি করে মাইল দুয়েক দূরে অল্প টাকায় জমি কিনে বাকি টাকা দিয়ে পাকা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। যে সব এনজিও তাদেরকে নতুন পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলধন জোগাচ্ছে, তাদের মধ্যে ব্র্যাক, ভার্ড, এফআইভিডিবি (ফ্রেন্ডস ফর ইনটিগ্রেটেড ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ), এসএসকেএস (সিলেট সমাজ কল্যাণ সংস্থা), সীমান্তীক, এসজেএ (সিলেট যুব একাডেমি), অন্যতম।

বেশির ভাগ সদস্য চলে যাচ্ছে মুদি দোকানদারি, শাক-সবজি বিক্রি ও মাছ বিক্রির দিকে। এর সঙ্গে রয়েছে স্কুটার ও রিকসা/ভ্যান চালানো। মহিলারা চলে যাচ্ছে নার্সারি পেশায়, সেটিরও মূলধন জোগাচ্ছে এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প। নার্সারি পেশায় মায়েদের সঙ্গে শিশুরাও এই পেশায় যাচ্ছে, বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা। তাদের ধারণা, এই পেশাগুলোর কোনটিতেই লোকসানের ভয় নেই। সঠিকভাবে কিস্তি পরিশোধ করেও তাদের লাভ থাকছে। যারা মাছ ধরা পেশা ছেড়ে চলে গেছে, তাদের মধ্যে পুরুষদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মূলধন নিয়ে মাছ বিক্রির পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। তারা বলেন, "চিরকাল মাছ ধরেছি, মাছ বিক্রি করেছি, এখন মাছ ধরা বাদ দিয়েছি বটে, তবে চিরচেনা পেশা মাছ বিক্রিটা সহজে ও দক্ষতার সঙ্গে করতে সক্ষম হচ্ছি, অন্য পেশায় গেলে নতুন হিসেবে হয়তো ভালো করতে পারবো না।"

উল্লেখ্য, খুবই কম সংখ্যক জেলে কৃষি কাজকে পরিবর্তিত পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তার কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে, "কৃষি কাজ সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো ধারণা নেই। বাপ দাদারা কোনদিন করেননি তো, তাই এখন দু চার জন শুরু করেছেন, কিন্তু অন্যরা ভয় পাচ্ছেন। তা ছাড়া কৃষি কাজ তেমন একটা লাভজনক পেশা নয়। ওতে ৫/৬ সদস্যের একটি পরিবার চালানো সম্ভব হচ্ছে না।"

কেউ কেউ বাবার জমি বিক্রি করে বিদেশ চলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রবীণরা জানান, "সাধারণ মুসলিম ও হিন্দু পরিবারগুলো আমাদেরকে এখনও হেয় মনে করে ঘৃণার চোখে দেখে। তা ছাড়া জেলে পরিবার ছাড়া আমাদের এখনও বিয়ে হয় না অন্য মুসলিম পরিবারে। কিন্তু যখন একজন ইংল্যান্ড গিয়ে অনেক টাকা কামাই করে আনছে, তখন সে যে

কোন মুসলিম পরিবারে বিয়ে করতে পারছে। এটিও হয়তো অন্য যুবকদেরকে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করছে।”

আগে জেলে পল্লীর কোন সদস্য অন্যের অধীনে কখনও চাকরি করতো না। জেলেরা নিজেদেরকে স্বাধীন পেশার অধিকারী মানবগোষ্ঠি বলে চিন্তা করতে ভালবাসতো। তবে এখন পেটের দায়ে কিছু ব্যক্তি বাজারে নাইট গার্ডের চাকরি নিয়েছে, বেশ কিছু তরুণ বাসের ড্রাইভারের অধীনে হেলপারগিরির চাকরি নিয়েছে। কেউ কেউ গ্যারেজে মেকানিক হিসেবে চাকরি নিয়েছে। এদেরকে এখনও জেলে গোষ্ঠির প্রবীণ লোকেরা ভালো চোখে দেখছে না। চাকরি করাকে তারা চাকরের কাজ বলে এখনও মনে করে।

নতুন করে গ্রহণকৃত সব পেশাতেই তাদের আয় বেড়েছে। তবে যারা গার্ডের, মেকানিকের ও হেলপারের চাকরি নিয়েছে, তারা কোন মতে দিনাতিপাত করছে। বাকি সব নতুন পেশার লোকেরা কিছু সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে এবং সঠিকভাবে কিস্তি শোধ করতে পারছে। চাকরিরতদের বাদ দিলে নতুন পেশার লোকদের আনুমানিক মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার কম নয়। এদের পরিবারে টিভিসহ অন্যান্য আসবাবপত্র দেখে একটু ভালো অবস্থায় আছে বলে অনুমান করা যায়। এমনকি, যারা কেবল মাছ বিক্রি করে (মাছ ধরে না), তারাও ভালো আছে।

৪. যারা এখনও জেলে হিসেবে মাছ ধরা পেশায় রয়েছে, তাদের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ

যারা এখনও জেলে হিসেবে মাছ ধরা পেশায় রয়েছে, তাদের বেশির ভাগই বয়সে প্রবীণ। এ ৮টি জেলে পল্লী নিয়ে একটি ‘জেলে কল্যাণ সমিতি’ নামে সমিতি আছে। তার সভাপতি জনাব হিরু মিয়া (ছদ্ম নাম)। তার বয়স প্রায় ৭৫ বছর। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে তিনি বলেন, “স্মৃতি ভুলতে পারি না বাবা, তাই এই পেশায় আছি। ছোট বেলায় বাবার সঙ্গে মাছ ধরেছি ওই বহুয়ার বিল, বাইক্কা বিল, জামকী বিল, হাকালুকি হাওর, সুরমা নদীতে। তখন তো কেউ মাছ ধরতে নিষেধ করতো না। আমরা মনে করতাম পৃথিবীর যেখানে মাছ আছে, সেখানেই আমাদের জাল ফেলার অধিকার আছে। এখন সমিতি থেকে আমরা লিজ নিতে যাই, অ-জেলের সমিতিগুলোই বেশি টাকা দিয়ে লিজ পেয়ে যায়। আমরা যে জেলে, আমাদের যে অগ্রাধিকার আছে, এই কথাটাই কেউ স্বীকার করে না, সরকারও কোন ব্যবস্থা করে না। তাই মাত্র ২ টা জলাশয় আমরা পেয়েছি লিজে, এখন ২৪৭টি পরিবার এ ২ জলাশয়ে কীভাবে সারা বছর লিজের টাকা শোধ করে দিন পার করবো, এক আল্লাহই জানে।”

প্রবীণরা হয় মাছ ধরার প্রতি ভালবাসায় অথবা অন্য কোন পেশায় যাবার ঝুঁকি নিতে না পারায় এই পেশাতেই রয়েছে। তা ছাড়া ঋণ গ্রহণকে তারা খুব ভয় করে। তারা শিক্ষিতও নয়। তাই নতুন মূলধন জোগানের বিষয়টি বুঝতে পারে না। তারা কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজকে খুব ভয় করে। আর কিছু পরিবার আছে, যারা নদী বা বিলের কাছাকাছি অবস্থান করে তারা সুবিধাজনক মনে করে এই পেশায় রয়েছে। কারণ যেটিই হোক না কেন, তারা এই পেশাকেই আঁকড়ে ধরে আছে।

একজন জেলে জানালো, গত রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত সে নদীতে জাল ফেলে ছিল। সারা রাতে মাত্র ১০০ টাকার মাছ পেয়েছে। তার পরিবারে ৫ জন লোক, এই টাকা দিয়ে তার দিন চলবে না। অথচ সে রাত জাগা মানুষ, সারা দিন তাকে ঘুমাতে হবে। অর্থাৎ নদীতে মাছের আকাল খুবই প্রকট, যা ২০ বছর আগে এরূপ ছিল না। তখন সারা রাত জাগলে কম পক্ষে ১০০০ টাকার মাছ পেতে পারতো। তাদের মতে সুরমা নদীর উজানে বরাক নদীর কোন না কোন স্থানে বাঁধ দেয়ার ফলে বিগত ২০ বছর ধরে বড় মাছ আর আসছে না। যতই দিন যাচ্ছে, ততই মাছের আকাল তীব্রতর হচ্ছে।

তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বক্তব্য থেকে নিম্নে বর্ণিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে:

ক) নদী, খাল, বিল, হাওরে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠা মাছের তীব্র অনটন।

খ) জেলেদের জলাশয়ের উপর অধিকার হ্রাস প্রাপ্তি।

গ) ওপেন টেন্ডারে লিজ প্রদানে জেলেদের অগ্রাধিকার না দেয়া।

ঘ) জেলেদের লিজ নেয়া জলাশয়ে চাঁদাবাজি ও মাস্তানির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ঙ) প্রয়োজনে সরকার থেকে জেলেদের মূলধন গঠনে বিনা জামানতে ও সুদে টাকা প্রদানের ব্যবস্থা না করা।

চ) জেলেদের লিজ নেয়া মৎস্য ক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগ ও জোর করে মাছ মেরে নেয়ার বিচার না পাওয়া।

ছ) বয়স্ক জেলেদের ভাতার আওতায় না আনা।

এই সকল বিষয়ই জেলেদের বর্তমানে তীব্র অনুভূত সমস্যা। এগুলোর দিকে কোন জন প্রতিনিধি, কোন মন্ত্রী বা কোন প্রশাসক কখনই নজর দিচ্ছেন না। হিরু মিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, “আমরা ক'জন প্রবীণ জেলে মারা গেলে এই এলাকায় কোন জেলে পল্লী ছিল তা কেউ আর সনাক্ত করতে পারবে না।”

তাদের মানসিক সমস্যাগুলোও পর্যালোচনার দাবি রাখে। পূর্বে এই ৮টি গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল জেলে। শহরের উপকণ্ঠে হওয়ায় এবং তুলনামূলকভাবে জমির দাম কম হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী কম দামে জমি কিনে নিয়েছে গরিব জেলেদের নিকট থেকে। জমি বিক্রি করে চলে যাওয়া জেলেরা এখন ৩/৪ মাইল দূরে গিয়ে কম দামে জমি কিনে পাকা ঘর বানিয়েছে। এখন যে সব জেলে এই গ্রামগুলোতে অবস্থান করছে, তারা চূড়ান্তভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গেছে। ফলে তাদের শক্তি কমে গেছে এবং স্বজন দূরে চলে যাওয়ার তারা মনোকষ্টে ভুগছে। সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ফলে তাদের প্রতিরোধ শক্তিও মারাত্মকভাবে কমে গেছে। ফলে তাদের পক্ষে সুরমা নদীতে মাছ ধরতে বাধা দেয়া লোকদের ত্রাস এবং লিজ নেয়া জলাশয়ে অবাধে মাছের চাষ করতে বাধা দেয়া গোষ্ঠির মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ভাবে চলতে থাকলে তারা এই পেশায় থাকার নিঃশেষ প্রায় শক্তির অবশিষ্টটুকুও হারিয়ে ফেলবে।

তাদের ভয় হচ্ছে, সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ফলে ভবিষ্যতে তাদেরকে বিয়ের পাত্র-পাত্রী জোগাড় করতে অনেক দূর যেতে হবে। তারা গরিব বলে এমনিতেই তাদের জীবন যাপনে যুথবদ্ধতার

অনেক বেশি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ক্রমাগতভাবে তারা তাদের স্বগোষ্টিকে হারাচ্ছে। তাই তারা ভবিষ্যতের অসহায়ত্বকে এখন থেকেই আশঙ্কিত চোখে দেখছে।

সুপারিশও উপসংহার

জেলে সম্প্রদায় একটি অতি প্রয়োজনীয় ও উপকারী সম্প্রদায়। তাদের আহরিত মাছের জোগান থেকে শহরে সম্প্রদায়ের নিত্য দিনের মাছের জোগান সচল থাকে। তাছাড়া তারা একটি প্রাচীন সম্প্রদায়ের উত্তরপুরুষ। তাদের বিলুপ্তি সমাজের ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটাবে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য কিছু নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয়। তাদের কল্যাণ সাধনে নিম্নে কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো। উল্লেখ্য, এই সব সুপারিশের অনেকগুলোই জেলে সম্প্রদায়ের পেশকৃত সুপারিশ থেকে নেয়া হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১. প্রাচীন কালের আপ্ত বাক্য "জাল যার, জলা তার" (১৮৮৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত জেলে সম্প্রদায় যে কোন নদী, খাল, বিল, হাওর ও বাওরে অবাধে মাছ ধরতে পারতো। কিন্তু ১৮৮৯ সালে বৃটিশ সরকার 'দি প্রাইভেট ফিসারিজ প্রটেকশান এ্যাক্ট-১৮৮৯' নামক আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিল, ও বদ্ধ জলাশয়, যেখানে ব্যক্তিগত জমি বিদ্যমান এবং তা কেবল বর্ষাকালে জলাবদ্ধ থাকে, সেগুলো লিজ দেবার আইন জারি করে। তার ফলে তাদের সেই অবাধ অধিকারটি খর্ব হয়ে যায়। তারপরেও এই সম্প্রদায় উন্মুক্ত জলাশয়ে ও বড় আকারের হাওর-বাওরে বিনা লিজেই মাছ ধরে বিক্রি করে আসছে। তাদের নিজেদের বানানো প্রবাদ হচ্ছে, জাল যার, জলা তার। বাস্তবে এটির কোন আইনগত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না এখন আর বিদ্যমান নাই। ২০০৯ সালে জারিকৃত 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯' অনুসারে এখন সকল জলাশয় (উন্মুক্ত ও বদ্ধ) টাকার বিনিময়ে লিজ দেয়া হয়ে থাকে। তবে এই নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই কেবল লিজ পাবার অধিকারী। সেই নীতি অনুযায়ী জলাশয় লিজ দেয়ার সময় সত্যিকার জেলে সম্প্রদায়কে সনাক্ত করে অগ্রাধিকার প্রদান ও তুলনামূলকভাবে কম দামে লিজ দেয়া হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২. তাদেরকে বিনা জামানতে ও বিনা সুদে ঋণ দেয়ার বিধান বলবৎ করতে হবে।

৩. তাদের পল্লীগুলোর কাছাকাছিতে ফ্রি সরকারি ক্লিনিক বা ডিসপেনসারি খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. তাদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসরতার জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা এবং ঝরে পড়া রোধ করার জন্য প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে প্রতিকার করতে হবে।

৫. জেলেদেরকে উত্যক্তকারী বা চাঁদাবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

৬. বিভিন্ন স্থানে জলাশয়ে বিষ প্রদান বা জোর করে মাছ ধরে নেয়ার প্রতিকার করতে হবে।

৭. তাদের গোত্রের জমি তাদের লোকদের নিকট বিক্রির নীতি ও আইন প্রণয়ন করতে হবে। অন্যথায় তারা ক্রমাগতভাবে সংখ্যালঘু হয়ে যেতে যেতে এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৮. যে কোন উন্মুক্ত জলাশয়ে তাদেরকে মাছ ধরার অধিকার দিতে হবে। লিজ নেবার ব্যবস্থাটি জেলেদের জন্য শিথিল করতে হবে।

৯. বয়স্ক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলে সম্প্রদায়ের জন্য কোটার ব্যবস্থা প্রত্যেক ওয়ার্ডে (যেখানে জেলে পল্লী রয়েছে) করতে হবে। সেগুলোতে ২/৩ জনের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

১০. ব্যাংক একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে তাদের জন্য অন্যান্য কৃষকের মত মাত্র ১০ টাকা জমা করার ব্যবস্থাটি বহাল করতে হবে।

তাদের পেশকৃত সুপারিশগুলোকেই একটুখানি পরিমার্জিত করে এখানে পেশ করা হলো। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি হয়তো শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা যাবে না। কিন্তু তাদের বর্তমান অসহায়ত্ব ও দিনাতিপাতের সমস্যাগুলো খোলা মনে একটু ভেবে দেখা দরকার। তা না হলে আমাদেরকে জেলে সম্প্রদায় বোঝাবার জন্য উত্তর পুরুষের নিকট ইতিহাস পেশ করতে হবে।

উপসংহার

প্রাচীন বাংলাদেশে বসবাসকারী বেশ কিছু পেশার জনগোষ্ঠি তাদের উপার্জন কমে যাওয়ায় বা পেশা বহাল রাখার মত কর্ম না থাকায় বিলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন, পালকি বয়ে নিয়ে যাওয়া 'বেহারা' জনগোষ্ঠি, ঘোড়ার গাড়ি চালানো 'কোচোয়ান গোষ্ঠি', হাতি চালানো 'মাহুতগোষ্ঠি', গাধার পিঠে কাপড় বয়ে নিয়ে যাওয়া 'ধোপা গোষ্ঠি' এখন বিলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত সম্প্রদায়। ওই সকল পেশায় তারা তাদের জীবন যাপনের মত রোজগার করতে না পেরে টিকে থাকতে পারেনি। বর্তমানে তারা অন্য পেশা গ্রহণ করে জীবন যাপন করছে। অনুরূপভাবে যদি এখনই উপার্জনের বা টিকে থাকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে হয়তো জেলে গোষ্ঠিও তাদের পেশা পাল্টিয়ে অন্য পেশায় চলে যাবে। এখনই তার সমূহ আলামত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অন্য ক্ষুদ্র পেশার জনগোষ্ঠির বিলুপ্তিতে হয়তো বা প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠির এই দেশে তেমন তীব্রতর অভাব অনুভূত হয়নি, কিন্তু জেলে পেশার এই জনগোষ্ঠি একটি বিশাল জনগোষ্ঠি। দেশের সব প্রান্তেই তারা ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে হাওর অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহ, যেমন: নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, নড়াইল, রাজবাড়ী এলাকায় তাদের বসবাস অনেক বেশি। এরা যদি সত্যিই কোন কারণে পেশা পরিবর্তন করে নতুন পেশায় স্থানান্তর করে চলে যায়, তাহলে মাছের জোগান প্রদানসহ মিষ্টি পানির মাছের জাত সংরক্ষণে দেশে বেশ একটা ঘাটতি অনুভূত হতে পারে।

তাদের সমস্যাগুলো বেশির ভাগই সমাধানযোগ্য। পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অনায়াসেই ভুয়া জেলে সমিতিগুলোর লিজ গ্রহণ বাতিল করা যেতে পারে। সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে তাদেরকে ঋণ দেয়া যেতে পারে। তাদেরকে সামান্য একটু কম দরে জলমহাল লিজ দেয়া যেতে পারে। তাদের সন্তানদের শিক্ষার্জনের পথ সুগম করে দেয়া যেতে পারে। তাদের উপর অত্যাচারকারী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা যেতে পারে। এই সহজ, সরল ও কষ্টসহিষ্ণু একটি সম্প্রদায়কে তাদের পেশায় টিকিয়ে রাখা গেলে বাংলাদেশের বিশাল এলাকার মৎস্য আহরণসহ মাছের চাষ বৃদ্ধি করাও সম্ভব হতে পারে। তারা দেশি মাছের চাষ বৃদ্ধিতে বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাদের মাধ্যমে হাওর-বাওর, খাল-বিলের আদি ও অকৃত্রিম মনোলোভা দৃশ্যগুলো টিকিয়ে রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের নীতি নির্ধারক ও প্রশাসকদের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। অবশ্য তার সাথে থাকতে হবে সুদূরপ্রসারী নীতি ও পরিকল্পনা।

তথ্য নির্দেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়। ২০১৫। বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা)। প্রজ্ঞাপন। “মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের সংশোধনী”। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয় (জুন ২৫, ২০১৫)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ২০১৩। প্রটেকশান এ্যান্ড কনভেনশান অব ফিস এ্যাক্ট ১৯৫০-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশকরণ। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয় (২৯.০৯.২০১৩)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভূমি মন্ত্রণালয়। ২০০৯। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয় (২৩.০৬.২০০৯)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়। ২০০৮। প্রজ্ঞাপন। “মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের সংশোধনী” (পিরানহা মাছ বিক্রয়, বিপণন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত)। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয়।

হক, মোহাম্মদ মুমিনুল। ২০০৬। সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত। ঢাকা: গতিধারা, বাংলাবাজার।

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার। অ্যাকোয়া কালচার মেডিসিন্যাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা। ঢাকা: সরকারি প্রকাশনালয়।

The Government of Bangladesh, M/O Fisheries & Livestock. 1985. *The Ammendment of Protection and Conservation of Fish Act-1950*. Dhaka: Govt.Gazzette.

The Government of Bangladesh, M/O Agriculture (Fisheries & Livestock Division). 1983. The Marine Fisheries Rules-1983. Dhaka: Govt.Gazzette.

The Government of Bangladesh, M/O Law & Land Reforms (Law & Parliamentary Affairs Division's Notification). 1983. *The Fish & Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance.* (Ord. no. 20 of 1983). Dhaka: Govt.Gazzette.

The Government of East Bengal Legislative Department. 1950. *Protection and Conservation of Fish Act-1950.* (East Bengal Act-18 of 1950). Ducca, East Pakistan.

The Government of Bengal. 1939. *The Tanks Improvement Act-1939.* (Bengal Act No. 15 of 1939). Calcutta, India.

The Government of Bengal. 1889. *The Private Fisheries Protection Act-1889.* (Bengal Act No. 2 of 1889). Calcutta, India.

Hossen, Billal. 2011. *The Socio-economic Condition of the Fishermen: A Study on Peerpur Village.*(An unpublished thesis of MSS degree, Dept. of Social Work, SUST).Sylhet.

গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

Abstract

In a research, informed consent is the means of reciprocal relationship between a research subject and researcher that results in the research's subject agreement to undergo a specific participation of research intervention. For moral reasons, a research subject must be given adequate information to be fully informed before deciding to do undergo a research which should also be recorded in writing form. The significance of informed consent gradually exercised in the field of procedures, research and health care because of its moral and legal gesture. This article focuses some common nature of informed consent in general and it also shows the suitability of ethical practices and assesses the practice of informed consent in research. To find out an idea about the knowledge, attitude and practices-pattern of informed consent in the field of research, this survey was conducted in January 2015 to December 2016. Among the researchers of social science, biological science and medical sciences, only one hundred twenty participants selected randomly from the researchers of postgraduate level. A set of structured questionnaire arrayed and supplied to the participants to know their knowledge, attitude and practice about informed consent. Through this study, the present article concludes that most of the researchers are not much knowledgeable about informed consent, even many of them have no primary knowledge to apply informed consent in practice.

ভূমিকা

গবেষণা, রাষ্ট্রীয় পলিসি প্রণয়ন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। গবেষণা ও

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চিকিৎসা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। কোন কাজটি রেখে কোনটি করতে হবে তাও এই বিরোধের কারণ। আবার মন্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালো কাজটি কি হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণও একটি জটিল বিষয়। সংকটাপন্ন ও উভমুখী অবস্থায় একজন ব্যক্তি কীভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন? চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীকে কী ধরনের চিকিৎসা সেবা দিতে পারবেন? একজন গবেষক তাঁর গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে কীভাবে বিবেচনা করবেন? বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি পরিহার করার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে গবেষণা সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি সম্পর্কে বিবেচনায় রাখতে হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিষয়ের তথ্যাদি অবগত করার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীর সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। অবহিত তথ্যাদির আলোকে একজন অংশগ্রহণকারী তাঁর সম্মতি বা অসম্মতি জানাবেন। ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে তিনি গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেন কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার। তবে গবেষক অংশগ্রহণকারীর উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবেন না। বরং অংশগ্রহণকারী যেন পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে সেজন্য প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পে কী ধরনের লাভ/ক্ষতি রয়েছে সে সম্পর্কেও তথ্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। অংশগ্রহণকারী স্বাধীন, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত ও স্ব-শাসনের আলোকে সম্মতি জানাবেন। কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ অথবা প্রভাব বা প্রলোভন খাটিয়ে এ সম্মতি আদায় করা যাবে না। গবেষক ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ বোঝাপড়াই হলো অবগতিক্রমে সম্মতির মূলকথা। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ বাস্তবতায় অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি গবেষক ও অংশগ্রহণকারীর জ্ঞান ও মনোভাব সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। আলোচনার ধারবাহিকতায় প্রথমে জানার চেষ্টা করেছি অবগতিক্রমে সম্মতি কী? বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা গবেষণায় কি অবগতিক্রমে সম্মতির রীতি অনুসরণ করা হয়? উপর্যুক্ত শেষতক প্রশ্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবার জন্য প্রশ্ন-সাক্ষাৎকারের (Questionnaire) ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

অবগতিক্রমে সম্মতি কী?

চিকিৎসা ব্যবস্থা, গবেষণা ও নতুন আবিস্কৃত ঔষধ ও জেনেটিক ফুডের ট্রায়ালের পূর্বশর্ত হিসেবে অবগতিক্রমে সম্মতিকে অনুশীলন প্রয়োজন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সম্পৃক্ত থাকে, তাদেরকে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। গবেষণা বা ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব কী হবে? ট্রায়ালের পরীক্ষামূলক দিক থেকে অংশগ্রহণকারীর কী ধরনের ঝুঁকি বা অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ থাকতে হবে। বোধগম্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিবরণ সংবলিত চুক্তিপত্রই অবগতিক্রমে সম্মতি। এখানে স্পষ্টতঃ উল্লেখ থাকতে হবে যে, স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা থেকে অংশগ্রহণকারী গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেন। তবে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে গবেষণা থেকে নিজেকে সরিয়েও নিতে পারেন। কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব খাটিয়ে কাউকে গবেষণায় সম্পৃক্ত রাখা যাবে না। অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে যে সব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তার গোপনীয়তা রক্ষাও অবগতিক্রমে সম্মতির মূল লক্ষ্য। সংশ্লিষ্ট গবেষণা বা ট্রায়ালে যদি নতুন কোন তথ্য থাকে তাহলে অংশগ্রহণকারীকে তা অবহিত করতে হবে। তা জেনে অংশগ্রহণকারী কাজটি চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক কিনা সে সম্পর্কেও তার মতামত স্পষ্ট করতে হবে।

সাম্প্রতিককালে গবেষণাকে নৈতিক মানদন্ডের আলোকে সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক গবেষণা

প্রতিষ্ঠানে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড রয়েছে। রিভিউ বোর্ড-এর কাজ হলো গবেষণার নৈতিক দিকসমূহ মূল্যায়ন করা। নৈতিক মূল্যায়নের প্রাথমিক শর্ত হলো গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির বাস্তবায়ন। আন্তর্জাতিক সংস্থা World Health Organasiation (WHO) এর ইথিক্যাল গাইডলাইনে অবগতিক্রমে সম্মতির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি ব্যক্তির স্ব-শাসন রক্ষা করতে সাহায্য করবে। মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় যদি কোনো গবেষণায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাকে অবশ্যই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে সহজ ও সরলভাবে । এর আরেকটি শর্ত হলো— কোনো প্রকার চাপ, বাহ্যিক প্রভাব ও প্রণোদনা, হুমকি ও প্রলোভন ছাড়াই অংশগ্রহণকারীকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিতে হবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো গবেষণা-সাবজেক্টের স্বার্থ সংরক্ষণ, কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসনের উন্নয়নকে সংরক্ষণ করা। অনেক সময় এসব লক্ষ্যসমূহ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তত্ত্ব যা দাবি করছে বাস্তবতার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এ ধরনের দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হবার কারণ হলো সাবজেক্টের কল্যাণ ও মূল্যকে সংজ্ঞায়িত করার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। প্রায়শই লক্ষ করা যায়— সাবজেক্টের কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসন উন্নয়নের প্রশ্নে প্যাটারনালিজম ও স্ব-শাসনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে থাকে। এই বিরোধ নিরসনের উপায় হিসেবেই প্রয়োজন দ্বন্দ্বের পরিধি ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এই অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব পারম্পরিক সংহতি ও সমন্বয় সাধন করা। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলনের বিষয়টিও এখানে রয়েছে। অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে গবেষক সত্যবাদিতার পরিচয় দিবেন, গবেষণার স্বার্থে অংশগ্রহণকারীর মতামতকে গুরুত্ব দিবেন, তার স্ব-শাসন ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখাবেন। অংশগ্রহণকারীর সম্মান ও মঙ্গলের কথা ভাবলেও এ দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব।

নীতি সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অবগতিক্রমে সম্মতি হলো— রিসার্চ-সাবজেক্টের স্ব-শাসন নিশ্চিত করা। এতে করে সাবজেক্ট কখনোই প্রতারণার শিকার হবেন না, সেবা পাবার জন্য সময়ক্ষেপণ করতে হবে না। এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসক, গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক স্বাধীনভাবে আত্ম-অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। একইভাবে রোগী ও রিসার্চ-সাবজেক্ট উভয়েই এই আত্ম-অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। এর মধ্য দিয়ে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের, কিংবা গবেষকের সঙ্গে গবেষণা-সাবজেক্টের পেশাগত প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি হবে। এই প্রতিশ্রুতি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, নিজেদেরকে স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতার জায়গায় থেকে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির লক্ষ্য হলো— গবেষণা-সাবজেক্টের প্রতি অবদমন, জোরজবরদস্তি ও প্রলোভন দেখিয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণ করানোর প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা। অন্যদিকে এটি গবেষক ও সাবজেক্ট-এর সম্পর্ক উন্নয়নেও সাহায্য করে থাকে। গবেষণায় যাদেরকে সাবজেক্ট হিসেবে নির্বাচন করা হয় তাদের স্বাধীনতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, গবেষণায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, অথবা গবেষণা বা ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করার ফলে তার স্বাস্থ্য ও মানসিক ঝুঁকি আছে কিনা এসব বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা খুবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তাই অবগতিক্রমে সম্মতির শর্ত পূরণে সাহায্য করে থাকে।

গবেষণায় কেন অবগতিক্রমে সম্মতি?

প্রশ্ন হতে পারে গবেষণায় কেন অবগতিক্রমে সম্মতির প্রয়োজন? এ প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন জড়িত, গবেষণায় কখন থেকে অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলন শুরু হয়েছে? একটা সময় ছিল যখন গবেষণা কিংবা চিকিৎসায় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব (Hard Paternailism) নীতির অনুসরণ করা হতো। এই নীতি অনুসারে, গবেষকই নির্ধারণ করবেন গবেষণায় কী হবে, কিংবা কী হবে না। এখানে গবেষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, অংশগ্রহণকারী হলো নিমিত্ত মাত্র। কঠোর পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের কয়েকটি আমূল দৃষ্টান্ত হলো: নাজি চিকিৎসা গবেষণা, আমেরিকার হপকিন্স মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেনেরিট্টা লেকস সেল গবেষণা ও টাসকিগি ইনস্টিটিউট পরিচালিত বর্ণ-আফ্রিকান আমেরিকানদের ওপর সিফিলিস গবেষণা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দী ইহুদিদের ওপর নাজি গবেষকদের পরিচালিত গবেষণা নৈতিক ব্যত্যয়ের একটি ভয়ংকর দৃষ্টান্ত। চোখের বর্ণের ভিন্নতা অনুসন্ধানের জন্য চৌদ্দ জোড়া যমজ শিশুর ওপর দীর্ঘ মেয়াদি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণা চলাকালীন সময়ে শিশুদের মৃত্যু হয়। যুদ্ধ-বন্দী ইহুদি নারীদের ওপর প্রফেসর কার্ল ক্লবার্গ এর জন্ম-উৎপাদক (Reproductive Medicine) ঔষধের ট্রায়াল আরেকটি দৃষ্টান্ত। নন-সার্জিকেল স্টেরিলাইজেশন কৌশলে ক্লবার্গ আবিষ্কৃত ঔষধ ইহুদি বন্দী নারীদের ওভারিতে প্রবেশ করানো হতো। এ ঔষধসমূহ এতোটা রাসায়নিক উপাদান যুক্ত যা ওভারিতে প্রবেশের কিছুক্ষণের মধ্যে মারাত্মকভাবে ওভারি ফোলে যেত। কিছু দিনের মধ্যে ঐসব নারীর ফ্যালোপিয়ান টিউব ফেটে বন্ধ হয়ে যেতো, যা অবধারিত মৃত্যুর কারণ ছিলো। ক্লবার্গের ট্রায়ালে অংশগ্রহণকৃত অসংখ্য নারীর মৃত্যু হয় এভাবে।

হেনেরিট্টা লেকস সেল (HeLa Cell) আবিষ্কারও অনৈতিক গবেষণার দৃষ্টান্ত। পাঁচের দশকে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয় আমেরিকার জন হপসকিন হাসপাতাল। হেনেরিট্টা লেকস আফ্রিকান-আমেরিকান একজন দরিদ্র তামাক চাষী। তিনি সার্ভিকেল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে উক্ত হাসাপাতালে ভর্তি হন। হস্পকিনস হাসপাতালের হেনরিট্টা লেকসের চিকিৎসক হাওয়ার্ড জোনস ও গবেষক জর্জ গে আবিষ্কার করেন হিলা কোষ। হেনেরিট্টার অনুমতি ছাড়াই তার সার্ভিক্স থেকে এ কোষটি সংগ্রহ করে গবেষণায় কাজে লাগানো হয়। এই কোষ বার বার বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ সৃষ্টি করতে সক্ষম। কার্যত কোষটি হলো মৃত্যুহীন। মৃত্যুহীন এই কোষটি পোলিও, ক্যান্সার চিকিৎসা ও HPV vaccine তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মিসেস লেকের সার্ভিক্স সেল নেওয়া হয়েছিলো তার অনুমতি ছাড়াই। তা ছিল মিসেস লেকস-এর পরিবারের প্রতি এক ধরনের অন্যায্যতা। নৈতিকতা বহির্ভূত গবেষণার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো আমেরিকার টাসকিগি ইনস্টিটিউট পরিচালিত "সিফিলিস পরীক্ষা"। আফ্রিকান-আমেরিকান প্রায় ৬০০ পুরুষের উপর গবেষণাটি চালানো হয়। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৩৯৯ জন সিফিলিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাদেরকে বিনামূল্যে মেডিকেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও খাবার সরবরাহের সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো। এমনকি মৃত্যুর পর তাদের সৎকার করার ফ্রি ইনসুরেন্স সুবিধাও রাখা হয়েছিলো। তাদেরকে বলা হয়েছিলো "তাদের শরীরে মন্দ রক্ত রয়েছে"[১] বিধায় তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন।

---

[১] সিফিলিস আক্রান্ত রোগীদের এই নামে অভিহিত করা হয়

প্রতিষ্ঠানে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড রয়েছে। রিভিউ বোর্ড-এর কাজ হলো গবেষণার নৈতিক দিকসমূহ মূল্যায়ন করা। নৈতিক মূল্যায়নের প্রাথমিক শর্ত হলো গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির বাস্তবায়ন। আন্তর্জাতিক সংস্থা World Health Organasiation (WHO) এর ইথিক্যাল গাইডলাইনে অবগতিক্রমে সম্মতির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি ব্যক্তির স্ব-শাসন রক্ষা করতে সাহায্য করবে। মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় যদি কোনো গবেষণায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাকে অবশ্যই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে সহজ ও সরলভাবে । এর আরেকটি শর্ত হলো— কোনো প্রকার চাপ, বাহ্যিক প্রভাব ও প্রণোদনা, হুমকি ও প্রলোভন ছাড়াই অংশগ্রহণকারীকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিতে হবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো গবেষণা-সাবজেক্টের স্বার্থ সংরক্ষণ, কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসনের উন্নয়নকে সংরক্ষণ করা। অনেক সময় এসব লক্ষ্যসমূহ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তত্ত্ব যা দাবি করছে বাস্তবতার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এ ধরনের দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হবার কারণ হলো সাবজেক্টের কল্যাণ ও মূল্যকে সংজ্ঞায়িত করার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। প্রায়শই লক্ষ করা যায়— সাবজেক্টের কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসন উন্নয়নের প্রশ্নে প্যাটারনালিজম ও স্ব-শাসনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে থাকে। এই বিরোধ নিরসনের উপায় হিসেবেই প্রয়োজন দ্বন্দ্বের পরিধি ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এই অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব পারস্পরিক সংহতি ও সমন্বয় সাধন করা। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলনের বিষয়টিও এখানে রয়েছে। অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে গবেষক সত্যবাদিতার পরিচয় দিবেন, গবেষণার স্বার্থে অংশগ্রহণকারীর মতামতকে গুরুত্ব দিবেন, তার স্ব-শাসন ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখাবেন। অংশগ্রহণকারীর সম্মান ও মঙ্গলের কথা ভাবলেও এ দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব।

নীতি সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অবগতিক্রমে সম্মতি হলো— রিসার্চ-সাবজেক্টের স্ব-শাসন নিশ্চিত করা। এতে করে সাবজেক্ট কখনোই প্রতারণার শিকার হবেন না, সেবা পাবার জন্য সময়ক্ষেপণ করতে হবে না। এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসক, গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক স্বাধীনভাবে আত্ম-অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। একইভাবে রোগী ও রিসার্চ-সাবজেক্ট উভয়েই এই আত্ম-অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। এর মধ্য দিয়ে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের, কিংবা গবেষকের সঙ্গে গবেষণা-সাবজেক্টের পেশাগত প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি হবে। এই প্রতিশ্রুতি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, নিজেদেরকে স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতার জায়গায় থেকে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির লক্ষ্য হলো— গবেষণা-সাবজেক্টের প্রতি অবদমন, জোরজবরদস্তি ও প্রলোভন দেখিয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণ করানোর প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা। অন্যদিকে এটি গবেষক ও সাবজেক্ট-এর সম্পর্ক উন্নয়নেও সাহায্য করে থাকে। গবেষণায় যাদেরকে সাবজেক্ট হিসেবে নির্বাচন করা হয় তাদের স্বাধীনতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, গবেষণায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, অথবা গবেষণা বা ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করার ফলে তার স্বাস্থ্য ও মানসিক ঝুঁকি আছে কিনা এসব বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা খুবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তাই অবগতিক্রমে সম্মতির শর্ত পূরণে সাহায্য করে থাকে।

গবেষণার প্রয়োজনে এ সময় তাদেরকে সিফিলিসের জন্য কোনো ঔষধ বা চিকিৎসা দেওয়া হয় নি। চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় সিফিলিস রোগ কোন পর্যায়ে যায় তা পরখ করাই ছিলো এই গবেষণার লক্ষ্য। এই গবেষণার সময়সীমা ছিলো ছয় মাস, কিন্তু তা পরিচালিত হয়েছিলো আরো চল্লিশ বছর। ১৯৭২ সালে *New York Times* এ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার হেলথ্ অ্যাফেয়ার্সের সায়েন্টিফিক সহকারী সেক্রেটারির দায়িত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি লক্ষ্য করেছে, গবেষণাটি একেবারেই অনৈতিক। পরিণতিতে সরকার তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ ক্ষমা চান। গবেষণার ইতিহাসে এটি বিপদজনক Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male হিসেবে সমধিক পরিচিত।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহের মতো আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যা ছিলো মানুষের মর্যাদা ও স্ব-শাসন বিঘ্নের ভয়ঙ্কর ইতিহাস। এসব দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানী নীতি নির্ধারক উভয়কে ইঙ্গিত করেছে যে, গবেষণার জন্য ব্যবহৃত স্যাম্পল ও উপাত্তসমূহ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা, কিংবা যুক্তিযুক্ত কিনা তা পরখ করে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্পর্কিত আলোচনায় বুলগার জানান, ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত নুরেমবার্গ কোডটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো নাজি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কৃতকর্মের বিচারের জন্য। এটি সর্বমোট দশটি নীতির সমাহার। কোনো গবেষণায় মানুষ যদি অংশগ্রহণকারী হয় সেক্ষেত্রে দশটি নীতি অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই দশটি নিয়মের ইতিবাচক প্রতিফলন হিসেবে আমরা অবগতিক্রমে সম্মতির বিকাশ লক্ষ করি। নুরেমবার্গ কোডে বলা হয়েছে— যদি কেউ কোনো গবেষণায় বা পরীক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তাহলে ঐ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর সম্মতি হতে হবে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে। অবগতিক্রমে সম্মতির ইতিহাস প্রসঙ্গে ফাদেন ও বিচাম[২] একথাই বলেন। বিশেষ করে মেডিকেল গবেষণায় যে নৈতিক দুর্দশা ও নৈতিক অপমানের জন্ম হয় তারই সূত্র ধরে অবগতিক্রমে সম্মতির বিকাশ। ডব্লিউ টি রিখ[৩] একই দাবি করেন। তিনি বলেন, নৈতিক অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যেই সামাজিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অবতারণা করা হয়। গবেষণায় যারা অংশগ্রহণকারী তাদের মর্যাদা, স্ব-শাসন ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে সম্মতি আদায় করার নির্দেশনাই হলো অবগতিক্রমে সম্মতির মূলনীতি।

নুরেমবার্গ ট্রায়ালের সমান্তরাল প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় হেলসিংকি ঘোষণায়[৪]। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নিরাপত্তা জোরদার ও গবেষণা প্রটোকলের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নীতিমালা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে এ ঘোষণায়। একই সঙ্গে গবেষণা প্রতিবেদনকে বহিঃপরীক্ষক বা বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাইকৃত হতে হবে, যাচাইয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশের অনুমোদন দেবার

---

[২] Faden and Beauchamp, 1986, p. 87.

[৩] Reich, W. T., 1996. 'Bioethics in the United States', in, *History of Bioethics: International Perspectives*, (eds.) Dell'oro, R., and Viafora, C., San Francisco: International Scholars Publications, p. 83.

[৪] WMA Declaration of Helsinki, 1964. " Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, included and corrected 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013, Articles : 25-32.

পরামর্শ করা হয়েছে। হেলসিংকি ডিক্লেরেশনের মতো বেলমন্ট রিপোর্টেও[৫] অবগতিক্রমে সম্মতির প্রসঙ্গ এসেছে। বেলমন্ট রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, পৃথিবীর নানা জায়গায় এখনও গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগী নানা রকম অবিচারের সম্মুখীন হচ্ছে। অজানা রোগের প্রাকৃতিক গতি-প্রকৃতি বোঝার জন পৃথিবীর নানা স্থানে এখনও নিষ্প্রভ ও শারীরিকভাবে অসংবেদনশীল শিশুদের টীকা প্রদান করা হচ্ছে। এরকম আরো অসংখ্য বিষয়ের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকায় প্রণয়ন করা হয় National Research Act of 1974। এরই পথ ধরে পরবর্তীতে Institutional Review Board (IRB) প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়। উক্ত বোর্ডের কাজ হলো গবেষণার প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করা এবং লক্ষিত স্বার্থগোষ্ঠী কিংবা অংশগ্রহণকারীকে অবহিত করার ভিত্তিতে সম্মতি আদায় করা। এই সম্মতিই অবগতিক্রমে সম্মতি হিসেবে সমধিক পরিচিত।

সম্মতির প্রসঙ্গটি এসেছে অংশিদারিত্বের ভাবনা থেকে। এ ভাবনার কারণে মনে করা হয় যে, কোনো স্বাস্থ্যসেবায় রোগী, বা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে প্রকৃত অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি। অবগতিক্রমে সম্মতির মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীর স্বার্থ, উপকার ও ভূমিকা নির্ধারণ করা যায়। ভোক্তাকেন্দ্রিক (Consumer-centred) মনোভাব সৃষ্টিতেও অবগতিক্রমে সম্মতি সাহায্য করে থাকে। অবগতিক্রমে সম্মতির কারণে কমিউনিটির সদস্যদের সেবা, কল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতি স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে থাকে। স্বাস্থ্যখাতে প্রযোজ্য সেবা, কৌশল, ও পদ্ধতির যথাযথ বণ্টন নিশ্চিত করে থাকে। চিকিৎসক রোগীকে যেসব চিকিৎসা দেবেন অবগতিক্রমে সম্মতির কারণে তিনি রোগীর সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কেও অবহিত করবেন। উক্ত বিষয়ে অন্য কোনো বিকল্প আছে কিনা, চিকিৎসার সফলতা বা ব্যর্থতা রয়েছে কিনা তাও রোগীকে অবহিত করবেন। গবেষণার ক্ষেত্রে রোগীর স্থলাভিষিক্ত হবে গবেষণা-অংশগ্রহণকারী। এখানে গবেষক হলেন চিকিৎসকের সমপর্যায়ের। আর রোগীর সমপর্যায়ের হলেন অংশগ্রহণকারী। গবেষক ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়াস ।

গবেষণা কৌশল ও পদ্ধতি

উক্ত গবেষণা কর্মটি পরিচালনার জন্য পর্যবেক্ষণমূলক ও ধারণাগত বিশ্লেষণ (Emprical and Conceptual Analysis) উভয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে সাক্ষাৎকার রীতি অনুসরণ করেছি। সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি উচ্চশিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আই.আর.বি'র সদস্য, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী/উপকারভোগী, গবেষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধান বা নির্বাহীদের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতার অবস্থাটি কোন্ পর্যায়ে রয়েছে সাক্ষাতের মাধ্যমে আমরা তা জানতে

[৫] WMA, 2000. "Declaration of Helsinki", World Medical Association, http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, accessed : 10 July, 2016.

পেরেছি। সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নসমূহের উত্তর থেকে জানতে পেরেছি যে, অবগতিক্রমে সম্মতির নৈতিক ভিত্তি, এ সম্পর্কিত জ্ঞান, সচেতনতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান । বিশেষ করে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি তাদের মনোভাব ও জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা অর্জনই উক্ত গবেষণার লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারীদের এ সম্পর্কিত কয়েকটি উপাত্ত এখানে প্রদান করা হলো :

সারণী ১ : অবগতিক্রমে সম্মতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অংশগ্রহণকারী

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	শিক্ষান্তর	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	নারী	পুরুষ
১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	১০টি	১. স্নাতক ২. স্নাতকোত্তর ৩.শিক্ষক ও গবেষক	১৮০জন	৮০	১০০
২. মেডিকেল কলেজ	০১টি		৬০জন	২০	৪০
৩. প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০১টি		১৫জন	৫	১০
অন্যান্য	০৩টি		৪৫জন	১৫	৩০

ক. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বণ্টন: পছন্দের তালিকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ মোতাবেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও অধিকতর। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর এই হার হলো যথাক্রমে ১৮০ : ৬০: ১৫: ৪৫। এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ অংশগ্রহণকারী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর মেডিকেল কলেজ, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য।

খ. লিঙ্গ বণ্টনের বিষয়টি গোটা গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলেও উক্ত গবেষণায় প্রতি-অংশগ্রহণকারীকে সম-একক হিসেবে বিবেচনা করেছি। লিঙ্গ বণ্টনের বিষয়টি এখানে দেখা যাক :

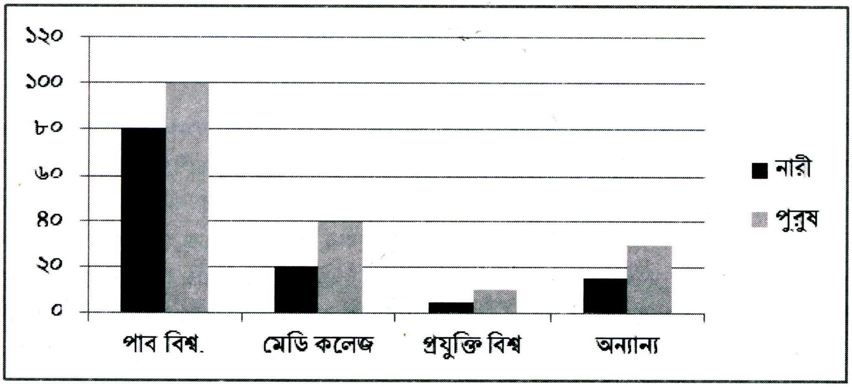

উপর্যুক্ত লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গ বণ্টনে নারী অপেক্ষা পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার বেশি। গবেষণার মাত্রা ও এ সম্পর্কিত ধারাটি বোঝার জন্য উপর্যুক্ত তালিকা থেকে প্রতিষ্ঠান, অংশগ্রহণকারী ও লিঙ্গভিত্তিক বণ্টন সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছি।

উক্ত গবেষণায় আরো কয়েকটি বিষয় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে:

১. গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করতে হবে।

২. গবেষণায় সাক্ষাৎপ্রার্থীর (রিসার্চ সাবজেক্ট) মৌখিক অবগতিক্রমে সম্মতি (Informed Consent), গোপনীয়তা (Confidentiality) সংরক্ষণ করা হয়েছে। একারণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নাম ও বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয় নি। সাক্ষাতপ্রার্থীদের কাছে প্রশ্নের একটি লিখিত অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যার সাহায্যে অংশগ্রহণকারী অনায়াসে অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছেন, কেউবা গবেষণাকর্মের সহকারী হিসেবে কাজ করছেন। এদের সবাইকে উক্ত গবেষণার অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি: বাংলাদেশ বাস্তবতা

চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির শর্তটি প্রাসঙ্গিক কারণে একটি আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ বাস্তবতায় এর প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা নানা কারণে গুরুত্ব বহন করে। বেশ কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এর প্রাসঙ্গিকতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই যেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে:

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কি অবগতিক্রমে সম্মতির রীতি অনুসরণ করা হয়?

২. অবগতিক্রমে সম্মতির রীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন্ ধারাটি অনুসরণ করা হচ্ছে? উক্ত প্রশ্নের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা হলো— বাংলাদেশ বাস্তবতায় অবগতিক্রমে সম্মতির ধরন কী? এ কি পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব (Paternalistic)? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে আমরা জেনে নিতে পারি পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব কী?

পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব হলো অনেকটা কর্তার ইচ্ছাই কর্ম করার সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের সামাজিক জীবনের নানা স্তরে এখনও পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ ধারা অনুসারে, ব্যক্তির ইচ্ছা, পছন্দ, স্বাধীনতা, মতামত এমন কী ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্ব পায় না। গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যারা গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তাদের ভূমিকা এখানে গৌণ। চিকিৎসার ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব দাবি করছে যে, চিকিৎসকই ভালো জানেন। চিকিৎসকের এই ভালো জানার অর্থ হলো রোগীর স্বার্থ, রোগীর কল্যাণ কীভাবে বৃদ্ধি পাবে তা নিয়ে চিকিৎসকই ভাববেন, অন্য কাউকে ভাবতে হবে না। আবার গবেষণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর কল্যাণ বা লাভ কীসে আসে তা নিয়ে গবেষকই ভাববেন। অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ নেই। গবেষণায় গবেষক, আর চিকিৎসা সেবায় চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেবেন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ও রোগীর কীসে লাভ, বা কীভাবে রোগী সেরে উঠবেন। স্বাধীনতা (Liberty), গোপনীয়তা (Confiedntiality),

অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন (Autonomy), কিংবা গবেষণালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of interest) রয়েছে কিনা তাও জানার প্রয়োজন নেই। পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বে অংশগ্রহণকারী ও গবেষক, চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে একতরফা সম্পর্ককে মেনে নেয়া হয়। এ সম্পর্কের কারণে গবেষণা পরিচালক দাবি করেন, লব্ধ গবেষণা ফলাফল অংশগ্রহণকারীর জন্য, সমাজের জন্য উপকারী, এই উপকারের কারণেই তাদেরকে গবেষণা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্য কোনো বিকল্প ভাবার সুযোগ এখানে নেই।

গবেষণা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরো সহজ করা যেতে পারে। যেমন, টীকা কর্মসূচি সম্পর্কে চিকিৎসক মনে করতে পারেন, টীকা কর্মসূচি জনগোষ্ঠীর সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে, ভবিষ্যতে তাদের এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে আসবে। শুধু এই স্বার্থে ব্যক্তিকে উক্ত কর্মসূচির আওতায় আসতে হবে না। এখানে সাবজেক্টের পছন্দ, স্বাধীনতা বা বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করা অপেক্ষা তাদেরকে টিকা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসাই হলো কর্তব্য কর্ম। পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব প্রভাবিত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক দাবি করবেন, গবেষণায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সংকটের প্রকৃত কারণ জানা যাবে যা নির্মূলের মাধ্যমে জনগণের সত্যিকার স্বার্থ উদ্ধার হবে। অন্যদিকে, অবগতিক্রমে সম্মতির মূলকথাই হলো লাভালাভের চেয়ে অংশগ্রহণকারীর পছন্দ ও স্বাধীনতাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। স্পষ্টতই লক্ষ করা যাচ্ছে, অবগতিক্রমে সম্মতির দার্শনিক লক্ষ্যের সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের বৈপরীত্য রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বে স্বাধীনতা ও পছন্দ অপেক্ষা লাভালাভের প্রতিই বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এ মতাদর্শ পরিণতিতে সম্মতি ও অবগতি উভয়ের প্রতি অবহেলা করে থাকে।

পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের বহুবিধ সংকট রয়েছে। এ সম্পর্কে অন্য যে প্রশ্নটি করা যায় তাহলো— সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব কি অভিজ্ঞতানির্ভর, নাকি মূল্যায়নমূলক? এ সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায়— গোটা প্রক্রিয়াটি স্বনিহিত অর্থে মূল্যায়নমূলক নয়। কারণ ব্যক্তি যখন কোনো বিষয়ে অন্য কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অবশ্যাম্ভাবীভাবে সেই সিদ্ধান্তটি দু'জনের মধ্যে আলোচনা, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও উপকারের সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এসব হলো পূর্বশর্ত। কিন্তু এ মতবাদ এসব পূর্বশর্তকে অনুসরণ করে না। অনুসরণ না করার ফলে অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন, মতামত ও কল্যাণ সবই লঙ্ঘিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বে এ ঘটনাটি যেভাবে ঘটছে তা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাতে পারি :

ধরা যাক, শফিক রহিমের প্রতি পিতৃতান্ত্রিক 'নীতি-প' অনুসারে কাজ করছে। এর অর্থ হলো :

১. 'নীতি-প' অনুসারে যে কাজটি করা হয়েছে তা রহিমের স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনকে বাধাগ্রস্ত করছে,

২. 'নীতি-প' কাজটি রহিমের সম্মতি বা মতামত নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি,

৩. শফিক হয়তো ভেবেছেন, 'নীতি-প' কাজটি করলে রহিমের স্বার্থ বৃদ্ধি, মূল্যের বিকাশ ও মঙ্গল সাধিত হবে।

উপর্যুক্ত তিনটি শর্তের আলোকে বলা যায়: স্বাধীনতা, স্ব-শাসন ও মতামত বিবেচনা না করে

রহিম সাপেক্ষে শফিকের ভাবনাই পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব। এজন্য বলা যায়— পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্বে ভোক্তা, অংশগ্রহণকারী (গবেষণার ক্ষেত্রে) বা রোগীর (চিকিৎসার ক্ষেত্রে) স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে না। এখানে গুরুত্ব পায় শারীরিক ও মানসিক চাপ, অনেক সময় মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করাও এর একটি লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে ব্যক্তির জানার অধিকারকেও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান থেকে ব্যক্তিকে বিরত রেখে ব্যক্তির ওপর অযাচিত শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হলো এর একটি দিক।

উপর্যুক্ত বিবেচনাকে সামনে রেখেই প্রশ্ন আসছে— বাংলাদেশ বাস্তবতায় [উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিপ্রেক্ষিতে] গবেষণায় কি অবগতিক্রমে সম্মতির প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে উক্ত গবেষণায় তিনটি দিক থেকে বোঝার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে :

ক. গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge),

খ. গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে মনোভাব (Attitude),

গ. গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলন (Practices)।

উপর্যুক্ত তিনটি দিক সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধানের ক্রমকে আমরা লাইকার্ট স্কেল পদ্ধতিতে পরিমাপ করেছি। এই স্কেলের আওতায় সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীর মতামতকে পাঁচটি ধাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণী ২ : লাইকার্ট স্কেল বিন্যাস

সবল অসম্মতি	অসম্মতি	সিদ্ধান্তহীনতা	সম্মতি	সবল সম্মতি
১	২	৩	৪	৫

খুব মন্দ → খুব ভালো/ মন্দ নিকৃষ্ট

অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে জ্ঞান

বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ১২০ জন নারী গবেষক, ও ১৮০ জন পুরুষ গবেষকের মধ্যে অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান রয়েছে তা জানার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সারণী ৩ : অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে জ্ঞান

প্রতিপাদ্য বিষয়	গবেষক									
	মহিলা (সংখ্যা ১২০ জন)					পুরুষ (সংখ্যা : ১৮০ জন)				
	১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫
১.আপনি কি জানেন অবগতিক্রমে সম্মতি কী?	২০	৬০	২০	১৫	৫	৩০	৫০	৪০	৪০	২০
২ গবেষণায় কি অবগতিক্রমে সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে?	৩০	৪০	৩০	১০	১০	৩০	৫০	৬০	৩০	১০
৩. অবগতিক্রমে সম্মতি কি লিখিত না মৌখিক?	৪০	৪০	১৫	১৫	১০	৫০	৪০	৫০	৩০	১০

৪. গবেষণায় কি অংশগ্রহণকারীকে চাপ প্রয়োগ করা হয়?	২০	৪০	২০	২০	২০	৬০	৫০	৩০	৩০	১০
৫. গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির	৫০	২০	৩০	১০	১০	৭০	৫০	২৫	২৫	১০
ক. কে অবগত করেন?										
খ. কে সম্মতি জানান?										
৬. অবগতিক্রমে সম্মতি কি অংশগ্রহণকারীর গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি করে?	৩৫	৩০	২৫	২৫	৫	৭০	৬০	৩০	১৫	৫
৭. অবগতিক্রমে সম্মতিতে কি অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন মেনে নেওয়া হয়?	৪০	২৫	২৫	২৫	৫	৬৫	৫৫	৩০	২০	৫
৮. অংশগ্রহণকারীকে গবেষণা সম্পর্কে কি বিস্তারিত জানানো হয়?	৩৫	৩৫	২০	২০	১০	৬০	৬৫	৩৫	১৫	৫
৯. গবেষণা প্রোটোকল সম্পর্কে কী জানেন?	২০	৩৫	৩৫	১৫	১৫	৪০	৪০	৩০	৪০	৩০
১০ অংশগ্রহণকারীকে কী জানানো হয়?										
ক. যেকোনো মুহর্তে অংশগ্রহণকারী গবেষণা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারেন, খ. তাতেও তার উপর কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, প্রলোভন দেখানো যাবে না। গ. অংশগ্রহণকারীরর ঝুঁকি আছে কিনা তা জানানো।	২২	৩৪	২৮	২৬	১০	৪২	৪৬	৪৩	৩৪	১৫

উপর্যুক্ত তথ্য উপাত্তকে নিচের স্তম্ভলেখে দেখাতে পারি :

স্তম্ভলেখ -১ : অবগতিক্রমে সম্মতির জ্ঞানের মাত্রা

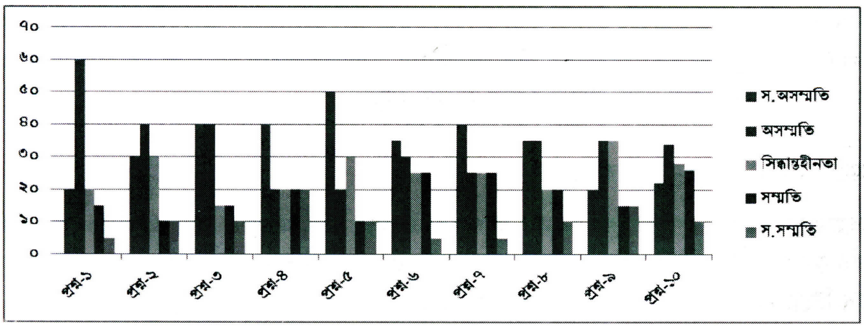

উপর্যুক্ত স্তম্ভলেখে মোট দশটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ করে দেখব প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের প্রতিক্রিয়ার মাত্রা ভিন্ন। তবে সবল সম্মতি অপেক্ষা অসম্মতির দিকে ঝোকটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি অংশগ্রহণকারী ও গবেষকদের জ্ঞান কীরকম হবে তা জানার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে গৃহীত উপাত্তকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের (Standard Deviation) মাধ্যমে দেখাতে পারি :

সারণী ৪: লিঙ্গভেদে প্রশ্নভিত্তিক আদর্শ বিচ্যুতি

প্রশ্ন সেট	নারী	পুরুষ
প্রশ্ন-১	৯.৬১৮	৯.৬১৮
প্রশ্ন-২	৪.১৮৩	৬.৫১৯
প্রশ্ন-৩	৫.৪৭৭	৪.১৮৩
প্রশ্ন-৪	৮.৯৪৪	১৯.৪৯
প্রশ্ন-৫	১৬.৭৩	২৩.৮২
প্রশ্ন-৬	১১.৪	২৮.১৫
প্রশ্ন-৭	১২.৪৫	২৪.৭৫
প্রশ্ন-৮	১০.৮৪	২৬.৫৫
প্রশ্ন-৯	১০.২৫	৫.৪৭৭
প্রশ্ন-১০	৮.৯৪৪	১২.৫৫

উপর্যুক্ত সারণীর আলোকে অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে গবেষকদের জ্ঞান কতোটুকু তা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। উপস্থাপিত তথ্য অনুসারে, সবল সম্মতির দিকে সূচক একেবারেই নিচের দিকে (১০ এর উর্ধ্বে নয়)। অবগতিক্রমে সম্মতি করা উচিত কিনা? এরকম বাস্তবতায় অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ উভয়ের যে হার তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, সবল অসম্মতি ও অসম্মতি উভয়ের দিকে আনুপপাতিক হার উর্ধ্বমুখী (১০ থেকে ৫০ মুখী, স্তম্ভলেখ-২)। এই উর্ধ্বমুখী রেখা প্রমাণ করে যে, গবেষকদের মধ্যে অবগতিক্রমে সম্মতির ধারণা অত স্পষ্ট নয়।

সনাক্তকৃত উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে? উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে কয়েকটি ধারণা নিচে আলোচনা করছি। বিপরীত দিকে, সবল সম্মতির দিকে এই মাত্রা ১০ এর নীচে (স্তম্ভলেখ-২)। সুতরাং, তুলনামূলক এই হার থেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বাংলাদেশের প্রচলিত গবেষণার ধারায় অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পর্কে গবেষক ও অংশগ্রহণকারীদের মনোভাব বা জ্ঞান সন্তোষজনক নয়। সিদ্ধান্তের এই মাত্রাটিকে সমাধান করার জন্য আমরা অবগতিক্রমে সম্মতির কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে পারি।

প্রথমত, অবগতিক্রমে সম্মতির অনুমোদন

আলোচনার শুরুতে আমরা জেনে নেব কীভাবে অবগতিক্রমে সম্মতি পরিচালনা করতে হয়। সম্মতি নেবার প্রক্রিয়াটি কাদের দ্বারা সম্পন্ন হবে? চূড়ান্ত সম্মতিপত্র কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে? নিচের চিত্রে এর একটি রূপরেখা উপস্থান করা হলো।

চিত্র ১ : অবগতিক্রমে সম্মতির রূপরেখা

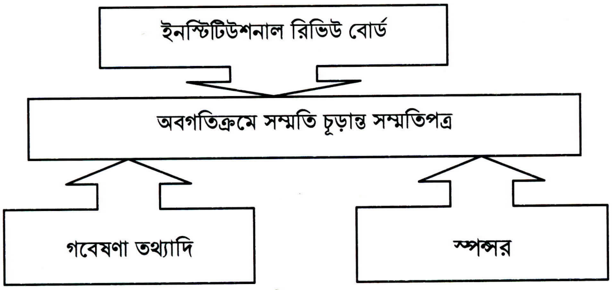

দুই. অবগতিক্রমে সম্মতি একটি প্রক্রিয়া

প্রথমেই আমরা জেনে নিতে পারি যে, অবগতিক্রমে সম্মতি কি শুধুই সম্মতিপত্র, নাকি প্রক্রিয়া? উল্লেখ্য যে, অবগতিক্রমে সম্মতির জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, এসব শর্ত অবশ্যম্ভাবী কারণে ধাপে ধাপে বিবেচনা করতে হয়। বিষয়টি এরকম নয় যে, একটি আবেদনপত্র তাতে স্বাক্ষর করলেই কাজ শেষ হয়ে গেল। এর যে সব ধাপ রয়েছে তার প্রত্যেকটিকে পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হয়। পর্যায়ক্রমে এই অনুসরণের কারণে বলা যায়, অবগতিক্রমে সম্মতি হলো একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া এমন যে, যিনি গবেষণায় অংশগ্রহণ করবেন তাকে ঐ গবেষণা ও ট্রায়াল সম্পর্কে খুঁটিনাটি অবহিত করতে হবে। অবহিতকরণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে এ সম্মতি জানাবেন। নৈতিক শর্তাদির আলোকে সুষ্ঠু সংগতিপূর্ণ গবেষণার জন্য প্রয়োজন অবগতিক্রমে সম্মতি। এটি শুধু কতোগুলো শর্ত ও নীতি উল্লেখ সাপেক্ষ ফর্মে স্বাক্ষর করা নয়। গবেষণায়, ট্রায়ালে কিংবা চিকিৎসায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতির মৌলিক কৌশলই হলো অবগতিক্রমে সম্মতি। অবগতিক্রমে সম্মতি প্রণয়নের জন্য আইনীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন রয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে গবেষণা বা উপকারভোগী বা ভোক্তা কর্মকান্ড পরিচালনা বা অনুমোদনের জন্য ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড (আই.আর.বি) থাকতে হবে। আই.আর.বি এর অধীনেই কেবল অবগতিক্রমে সম্মতি সম্পন্ন হতে হবে। উক্ত প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

এক. অবগতিক্রমে সম্মতিপত্রের পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনায় গুরুত্ব পাবে:

১. গবেষণার জন্য গৃহীত প্রজেক্ট থাকতে হবে।

২. প্রজেক্টটিতে যেসব প্রস্তাবনা থাকবে তাকে অবশ্যই স্পষ্ট, বোধগম্য, সহজ ও সরল পাঠযোগ্য হতে হবে। সর্বোপরি প্রস্তাবনায় গোটা প্রজেক্টের ধারণার প্রতিফলন থাকতে হবে।

দুই. অবগতিক্রমে সম্মতির আদায়ের জন্য প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে প্রযোজ্য হলো:

কার জন্য অবগতিক্রমে সম্মতি, কে অবগতিক্রমে সম্মতি আদায় করবেন, কোথায় অবগতিক্রমে সম্মতি নেওয়া হবে, কীভাবে নেওয়া হবে, এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

প্রশ্ন হলো সম্মতি প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে, অবগতিক্রমে সম্মতির প্রক্রিয়াটিকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি:

চিত্র ২: সম্মতি প্রক্রিয়া

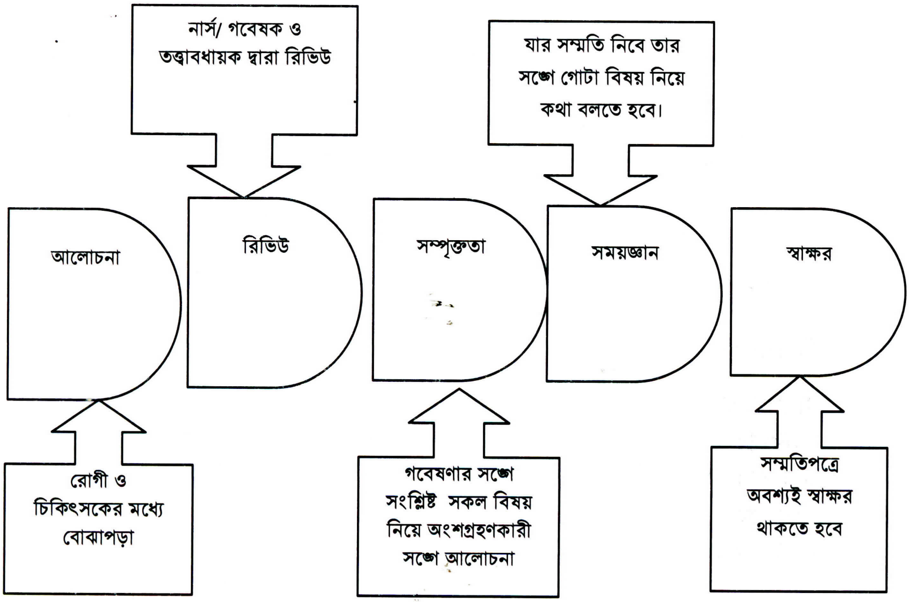

সম্মতির গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য চারটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে এর মধ্যে থাকবে পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সম্মতি প্রদান। এ চারটি ধারা পর্যায়ক্রমে চারটি ধাপে সম্পন্ন হবে। সম্মতির পরিপূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে এভাবে দেখাতে পারি:

চিত্র ৩: অবগতিক্রমে সম্মতির পরিপূর্ণ প্রক্রিয়া

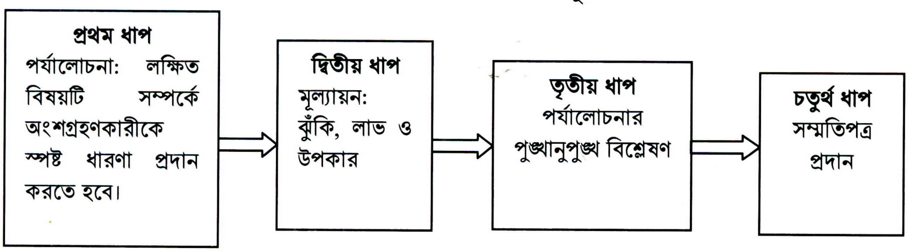

প্রথম ধাপ : যাদের সম্মতি প্রয়োজন তাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা, প্রলোভন কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে সম্মতি আদায় করা যাবে না। যে বিষয়টিতে সম্মতি প্রদানের জন্য বলা হচ্ছে— সে সম্পর্কে তাকে স্পষ্ট, খুঁটিনাটি জানাতে হবে যেন ঐ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীর কোনো অস্পষ্টতা না থাকে। গোটা বিষয় সম্পর্কে তথ্য, ঘটনা, সমস্যা, লক্ষ্য, ফলাফল ইত্যাদি প্রয়োজন হলে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সুনির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী ও প্রথমপক্ষ উভয়ই প্রশ্ন করে সমস্যাটি সম্পর্কে জেনে নিতে পারবেন। অংশগ্রহণকারীকেও প্রশ্ন করার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রয়োজনে সময়ক্ষেপণও করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণকে সক্রিয় ও নিশ্চিত করার জন্য গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে

তার সঙ্গে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পর্যালোচনা এমন হতে হবে যেন অংশগ্রহণকারী গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করতে হবে স্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায়। বোধগম্য করার জন্য কয়েকটি শর্ত অনুসরণ করা প্রয়োজন:

১. তথ্যটি প্রয়োজনে বারবার উপস্থাপন করা।

২. তথ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হয়েছে কিনা তা যাচাই বাছাই করা।

৩. পর্যালোচনার জন্য সময়জ্ঞানও জরুরি।

দ্বিতীয় ধাপ : যে বিষয় সম্পর্কে সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীকে সকল তথ্যাদি জানাতে হবে। সমস্যা বা বিষয়ের অন্য কোনো বিকল্প আছে কিনা বিকল্পের ঝুঁকি ও উপকার কি তাও অংশগ্রহণকারীকে অবহিত করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ. এ ধাপটি হলো সক্রিয়তার পর্ব। এ পর্যায়ে ট্রায়ালে বা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, সম্মতিপত্র সরবরাহ করতে হবে। অংশগ্রহণকারী যদি অক্ষম বা নিস্ক্রিয় হয় তাহলে উক্ত কাগজপত্র তার নিকটাত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রহণ করতে পারবেন।

তিন. অবগতিক্রমে সম্মতিপত্রের শর্তাদি

অবগতিক্রমে সম্মতি পত্রে কী করা হবে, আর কী করা যাবে না তারও একটি স্পষ্ট তালিকা থাকবে।

যা করতে হবে		যা করা উচিত নয়
সহজ সরল করে প্রস্তাবনা বা প্রোটোকল লিখুন, ছোট ও সহজ শব্দ ব্যবহার করুন। সমস্যার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করতে হবে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ঝুঁকি ও মুনাফার বিবরণ থাকতে হবে। সহায়ক বা সহযোগী শব্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে।	⟺	জটিল শব্দ বা ধারণার ব্যবহার, জটিল ধরনের ফরম ব্যবহার, ফর্মে অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও বর্ণনা উপস্থাপন করা, ব্যক্তিসত্তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, গবেষণার বিষয়কে জটিল ও অপ্রাসঙ্গিক রাখা

একই ফর্মের দুটি অংশ থাকবে। তবে উল্লেখ্য যে, গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির স্বরূপ, আর ডাক্তার চিকিৎসক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবগতি সম্মতির স্বরূপ অভিন্ন হবে না। যেমন, গবেষণার ক্ষেত্রে যে অবগতিক্রমে সম্মতিপত্র প্রদান করা হবে তার দুটি অংশ থাকবে:

ক. প্রথম অংশে গবেষণা সম্পর্কে তথ্যাদি থাকবে,

খ. দ্বিতীয় অংশে থাকবে তথ্যাদির ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীর সম্মতি প্রদান।

এ দুটি একসাথে মিলে হবে 'অবগতিক্রমে সম্মতিপত্র'। গবেষণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও বোধের সঙ্গে সমন্বয় করে ভাষা ব্যবহার করতে হবে। গোটা প্রক্রিয়াটিকে এভাবে দেখানো যেতে পারে:

চিত্র ৪ : সম্মতিপত্রে ভাষার ধরন ও স্পষ্টতা

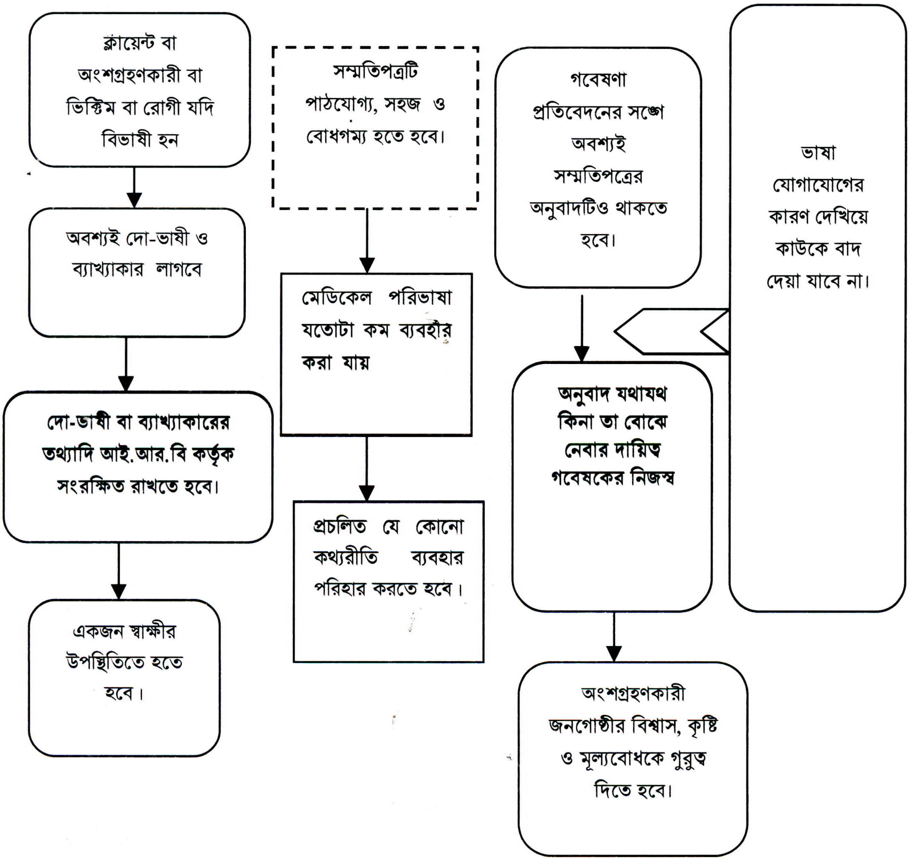

ক. কখন সম্মতি : সম্মতির আরেকটি শর্ত হলো এর সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া। সম্মতির সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয় গুরুত্ব পাবে :

১. কখন সম্মতি নিতে হবে?

২. যদি প্রতিষ্ঠানের আই.আর.বি'র চাহিদা থাকে তাহলে সে মোতাবেক তা সম্পন্ন করতে হবে।

সম্মতি যদি মৌখিকভাবে হয় সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এমনও হতে পারে অনেক আই.আর.বি তাদের প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সাক্ষ্য চাইতে পারে।

খ. কে সাক্ষ্য হতে পারবে : চলমান গবেষণা থেকে নিরপেক্ষ, কিংবা গবেষণা যারা পরিচালনা করছেন তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নেই কেবল তারাই সাক্ষী হতে পারবেন। এই সাক্ষীকে নিঃশর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা তিনি কোনোভাবে প্রভাবিত হতে পারবেন না।

চার. অবগতিক্রমে সম্মতির যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া: প্রোটোকল অনুসারে যে কোনো গবেষণা কর্ম শুরু করবার পূর্বে অবগতিক্রমে সম্মতি একটি পূর্বশর্ত। যেদিন সম্মতিপত্র স্বাক্ষরসহ সম্পাদনের সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে সেদিন থেকেই প্রোটোকল অনুসারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করা যাবে। তবে গবেষণা রেকর্ডের অংশ হিসেবে সকল তথ্য ক্রমান্বয়িক রীতি অনুসারে সংরক্ষণ রাখতে হবে।

পাঁচ. বিপন্ন জাতিগোষ্ঠীও অবগতিক্রমে সম্মতি: বিপন্ন জাতিগোষ্ঠীর (Vulnerable Population) ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির জন্য বিশেষ কিছু শর্ত অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য গবেষককে জেনে নিতে হবে বিপন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্য কারা? আর শর্তসমূহই বা কী? শিশু ও কয়েদি, নন-ইংলিশ ভাষাভাষি (যেমন আরবী ভাষাভাষি), গর্ভবতী নারী, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি, শারীরিকভাবে মারাত্মক অসুস্থ, দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত, মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, জ্ঞানিক দিক থেকে সামর্থহীন (Cognitively Impaired) এদেরকে বিপন্ন জাতিগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বিপন্ন ও সামর্থ্যহীন ব্যক্তিরা প্রায় ক্ষেত্রেই স্বাধীন সম্মতি দিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে খুব অনায়াসে, সহজে কিংবা নামমাত্র চাপ প্রয়োগে সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে। শারীরিক ও মানসিক কারণে তারা সীমিত স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে।

ছয়. গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর বয়স: অংশগ্রহণকারী যদি ১৮ বছরের নিচে হয় তাহলে কীভাবে সম্মতি আদায় করতে হবে? ১৮ বছরের নিচে সম্মতির প্রয়োজনটি মাইনর কেস হিসেবে গণ্য হবে। অধীনস্থ/মাইনর কেসের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া এভাবে সম্পন্ন হবে:

চিত্র ৫ : অংশগ্রহণকারীর বয়স

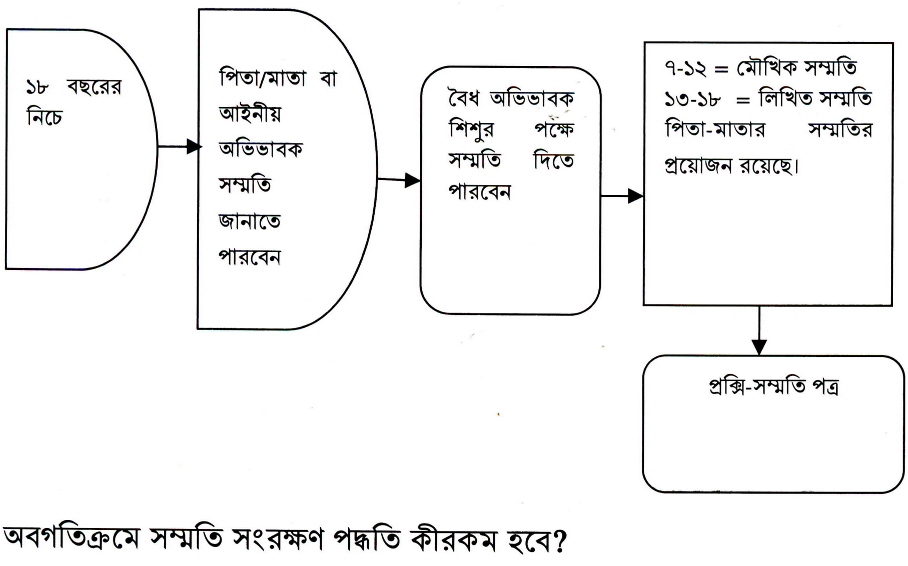

অবগতিক্রমে সম্মতি সংরক্ষণ পদ্ধতি কীরকম হবে?

অবগতিক্রমে সম্মতিপত্র সংরক্ষণ করার জন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ

করার প্রক্রিয়াটি নীচে দেখানো হলো:

সারণী ৫ : অবগতিক্রমে সম্মতি সংরক্ষণ পদ্ধতি

রেকর্ড অব ইনফরমড কনসেন্ট (অবগতিক্রমে সম্মতি সংরক্ষণ) (অবগতিক্রমে সম্মতি পরিচালনার জন্য আইনীয় প্রতিষ্ঠান)
আই.আর.বি আই
অনুমোদিত গবেষণা শিরোনাম: সম্মতিদাতার নাম: হাসপাতাল বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম:
ঠিকানা: গবেষণা প্রধানের নাম ও ঠিকানা অংশগ্রহণকারীর সম্মতির তারিখ:
গবেষণা প্রস্তাবনার বিবরণ: ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, খ. গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি, গ. গবেষণার পরিধি
অংশগ্রহণকারীকে কি কোনো ড্রাগ সেবন করাতে হয়েছে ? হ্যাঁ: না: যদি হ্যাঁ হয় তাহলে : ১. ড্রাগের নাম, ২. গবেষণা পরীক্ষার জন্য কি এসব ড্রাগ ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা করা হবে?
অংশগ্রহণকারীর বিশেষ কোনো বাস্তবতা আছে কিনা? যেমন, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত অবস্থান

সম্মতিপত্রে চূড়ান্তকরণ প্রসঙ্গে

কীভাবে চূড়ান্তপত্র নির্ধারণ করতে হবে সে সম্পর্কেও গবেষকের ধারণা থাকতে হবে। এখানে হয়তো একজন গবেষক আই. আর.বি নির্ধারিত প্রোফর্মা ও গঠন কৌশল মেনে নিতে হবে।

চিত্র ৬: কীভাবে সম্মতিপত্র চূড়ান্ত করতে হবে?

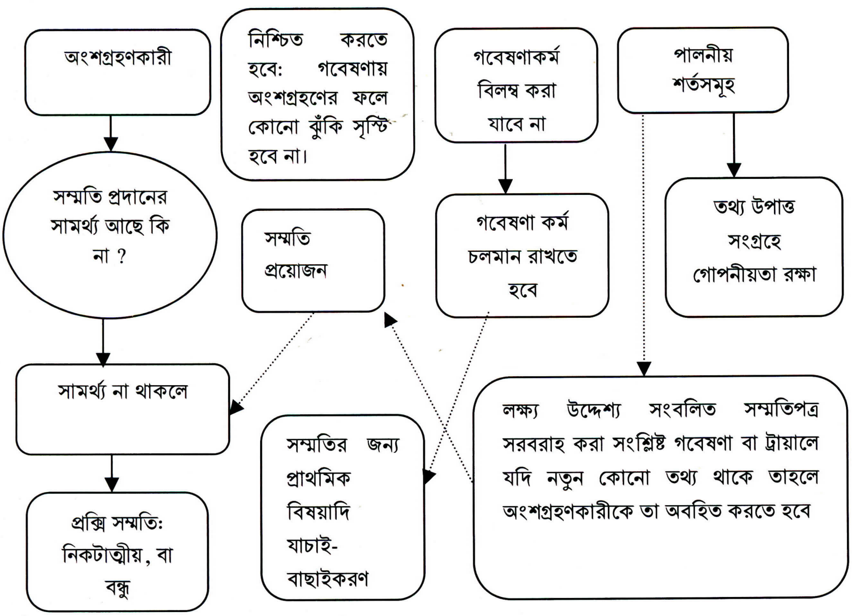

অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি মনোভাব

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক, অংশগ্রহণকারীদের অবগতিক্রমে সম্মতি প্রসঙ্গে মনোভাব জানার জন্য গবেষণায় নিম্নোক্ত প্রশ্নাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবহৃত তথ্যাদি এখানে উপস্থাপন করা হলো:

সারণী ৬: অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি গবেষকদের মনোভাব

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন গবেষণা শুরুর পূর্বে অংশগ্রহণকারীর অবগতিক্রমে সম্মতি নেবার প্রয়োজন রয়েছে?										
	নারী (সংখ্যা : ১২০)					পুরুষ (সংখ্যা : ১৮০)				
প্রতিপাদ্য বিষয়/ লাইকার্ট স্কেল	১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪	৫
১. অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন ও মর্যাদা রক্ষার কারণে সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন	৩০	৩৫	২৫	২০	১০	৪০	৪০	৪৫	৩৫	২০
২. অংশগ্রহণকারীর কীসে সম্মতি দিবে কিংবা দিবে না সে প্রসঙ্গে তার স্বাধীনতা রয়েছে	২৫	৩০	২০	২৫	২০	৪৫	৩০	৪০	৩৫	৩০
৩. গবেষকের গবেষণা কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে গবেষণায় অংশগ্রহণ করা উচিত	৩০	২৫	২৫	২৫	১৫	২৫	২৫	৩০	২০	২০

উপর্যুক্ত সারণী-৫ এর আলোকে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি নারী গবেষকদের প্রতিক্রিয়ার ধরনটি নিচের স্তম্ভরেখায় দেখানো যেতে পারে:

স্তম্ভলেখ ২ : অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি নারী গবেষকদের মনোভাব

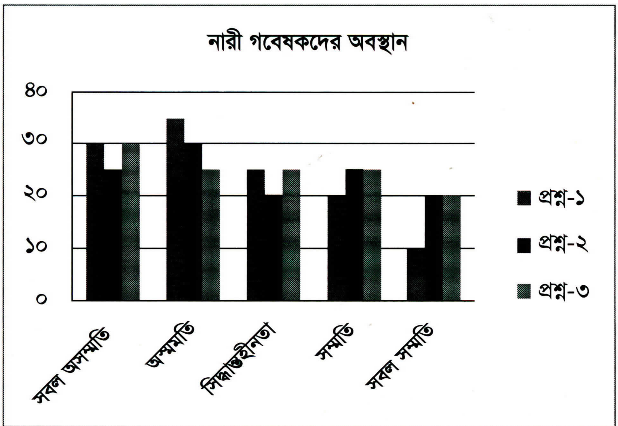

স্তম্ভলেখ ৩: অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি পুরুষ গবেষকদের মনোভাব

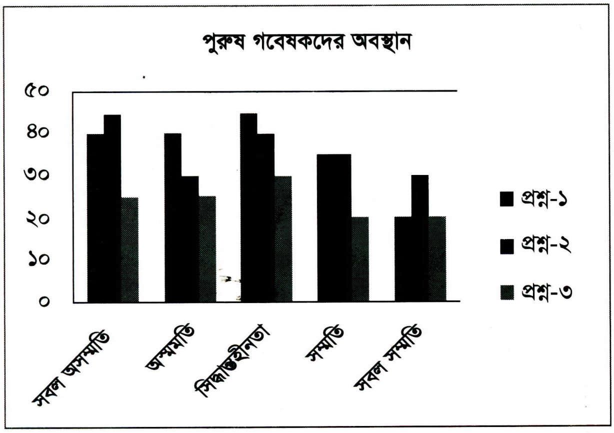

উপর্যুক্ত স্তম্ভলেখ (স্তম্ভলেখ ২ [নারী গবেষকদের জন্য] ও ৩ [পুরুষ গবেষকদের জন্য]) সবল-অসম্মতি ও অসম্মতি উভয়ই ৩০-৩৫ [তদূর্ধ্ব] স্কেলের মধ্যে রয়েছে। সবল-অসম্মতির জন্য নারী গবেষকদের অবস্থান: প্রশ্ন-১ ও প্রশ্ন-৩ সাপেক্ষে ৩০ স্কেল, আর প্রশ্ন-২ সাপেক্ষে ২৫ মাত্রায়। উক্ত স্কেল থেকে আমরা বলতে পারছি যে, অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি নারী গবেষকদের সম্মতি (সবল সম্মতিসহ) অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তুলনামূলকভাবে সবল-অসম্মতিই ক্রিয়াশীল (স্কেল ৩০-৩৫ পর্যন্ত)। আবার, একই সারণীর তথ্য উপাত্তের মধ্যে পুরুষ গবেষকদের অবস্থাটি লক্ষ করা যাক। উপর্যুক্ত স্তম্ভরেখায় (স্তম্ভলেখ ৩) সবল-অসম্মতি ও অসম্মতি উভয়ই ২৫-৩৫ স্কেলের মধ্যে, অন্যদিকে সবল সম্মতি হলো ১০-২০ স্কেল পর্যন্ত। এই স্কেল থেকে আমরা বলতে পারছি যে, অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি (পুরুষ) গবেষকদের সম্মতি (সবল সম্মতিসহ) অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তুলনামূলকভাবে সবল অসম্মতিই ক্রিয়াশীল (স্কেল ২৫-৪৫ পর্যন্ত)। নারী ও পুরুষ উভয় গবেষকদের অবস্থানই একই পর্যায়ে রয়েছে।

উক্ত গবেষণায় আমরা আরেকটি বিষয়ে নিরীক্ষা চালিয়েছি, তাহলো বাংলাদেশে গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলনের মাত্রা কীরকম? এ প্রসঙ্গে আমরা গবেষকদের নিম্নোক্ত বিষয়াদির ওপর প্রশ্ন করি। এসব প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলকে এখানে উপস্থাপন করা হলো:

সারণী ৭: অবগতিক্রমে সম্মতির অনুশীলন

অংশগ্রহণকারী ১৬০ জন	অংশগ্রহণকারী ১২০ জন	নারী	সংখ্যা	পুরুষ	সংখ্যা
১. গবেষক হিসেবে আপনি কি অংশগ্রহণকারীর সম্মতিকে গুরুত্ব দেন? ২. অথবা সম্মতি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন?	সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ (সংখ্যা ৬০ জন) নারী (৩০জন) পুরুষ (৩০ জন)	সবল অসম্মতি	৬	সবল অসম্মতি	৭
		অসম্মতি	৬	অসম্মতি	৬
		সিদ্ধান্তহীনতা	৭	সিদ্ধান্তহীনতা	৭
		সম্মতি	৬	সম্মতি	৬
		সবল সম্মতি	৫	সবল সম্মতি	৪
	কলা ও মানবিকী অনুষদ (সংখ্যা ২০ জন) নারী (১০জন) পুরুষ (১০ জন)	সবল অসম্মতি	৩	সবল অসম্মতি	২
		অসম্মতি	৩	সম্মতি	১
		সিদ্ধান্তহীনতা	২	সিদ্ধান্তহীনতা	২
		সম্মতি	১	সম্মতি	৩
		সবল সম্মতি	১	সবল সম্মতি	২
	প্রাণবিজ্ঞান (সংখ্যা ৩০ জন) নারী (১৫জন) পুরুষ (১৫ জন)	সবল অসম্মতি	৪	সবল অসম্মতি	৪
		অসম্মতি	৫	অসম্মতি	৫
		সিদ্ধান্তহীনতা	৩	সিদ্ধান্তহীনতা	২
		সম্মতি	২	সম্মতি	৩
		সবল সম্মতি	২	সবল সম্মতি	১
	চিকিৎসাবিজ্ঞান (সংখ্যা ৪০ জন) নারী (২০জন) পুরুষ (২০ জন)	সবল অসম্মতি	৮	সবল অসম্মতি	৭
		অসম্মতি	১০	অসম্মতি	৬
		সিদ্ধান্তহীনতা	৬	সিদ্ধান্তহীনতা	৪
		সম্মতি	৪	সম্মতি	৬
		সবল সম্মতি	৪	সবল সম্মতি	২

উপর্যুক্ত সারণী থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, অবগতিক্রমে সম্মতি বিষয়ে গবেষকদের জ্ঞান নিম্ন পর্যায়ের। এই নিম্ন পর্যায়ের জ্ঞানের মাত্রা নির্দেশ করে যে, গবেষণা পরিচালনার সময় গবেষকগণ অবগতক্রিমে সম্মতির বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করেন নি। উক্ত তথ্য-উপাত্ত অবগতিক্রমে সম্মতির প্রশ্নে গবেষকগণ খুব একটা সচেতনও নন। অবগতিক্রমে সম্মতির প্রতি গবেষকদের সবল অসম্মতি এ বিষয়টিই ইঙ্গিত করে।

অবগতিক্রমে সম্মতির কারণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সম্মতি হবে ঐচ্ছিক। ঐচ্ছিক সম্মতির (Voluntary Consent) অর্থ হলো কোনো প্রকার চাপ বা জোরজবরদখল করে অংশগ্রহণকারীর সম্মতি আদায় করা যাবে না। অংশগ্রহণকারীকে গবেষণার গোটা পরিস্থিতি বুঝিয়ে, এর ঝুঁকি ও উপকার সম্পর্কে অবহিত করে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য

বলা হয়— হাসপাতালে রোগীর, আর গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর অধিকারের নিরাপত্তা প্রদানে সাহায্য করে থাকে অবগতিক্রমে সম্মতি। সম্মতি একাধারে অংশগ্রহণকারী ও রোগীর মর্যাদা, ও তাদের প্রতি কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যে গবেষণায় মানুষকে সাবজেক্ট হিসেবে নিতে হবে সেখানে অবগতিক্রমে সম্মতি হলো প্রাথমিক নৈতিক নীতি। এর ফলে গবেষণার অংশগ্রহণকারী বুঝতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট গবেষণার স্বরূপ কী, কিংবা মানুষ ও সমাজের জন্য তা কতোটা কাজে আসবে। এসব বিবেচনা সামনে রেখে একজন অংশগ্রহণকারী সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মতি জানাতে পারে সে তাতে অংশগ্রহণ করবে কিনা।

ক. অংশগ্রহণকারীর জন্য

১. অবগতিক্রমে সম্মতি কী?
২. অবগতিক্রমে সম্মতির সাথে কারা যুক্ত?
৩. অবগতিক্রমে সম্মতিতে কারা সম্মতি দিতে পারে?
৪. অংশগ্রহণকারীর লাভ-ক্ষতি কী কী রয়েছে?

খ. প্রতিষ্ঠানের জন্য

১. আই.আর.বি অনুমোদন রয়েছে কিনা?
২. আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?
৩. সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিন ও বিশেষজ্ঞতার মানদণ্ড মানা হয়েছে কিনা?

গ. গবেষকদের জন্য:

১. অবগতিক্রমে সম্মতি কী? ও
২. অবগতিক্রমে সম্মতির উপাদানসমূহ কী কী?

অবগতিক্রমে সম্মতির মৌলিক উপাদান

গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির উপাদানসমূহ কী হবে? এখানে অংশগ্রহণকারীকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই গুরুত্বের মধ্যে যেসব তথ্য উপাত্ত বিবেচনায় রাখতে হবে তা হলো: গবেষণা-পরিকল্পনা, ঝুঁকি ও উপকার, অংশগ্রহণের জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা, গবেষণার মেয়াদকাল, সেখানে অংশগ্রহণকারীর অবস্থান কীরকম হবে তা জানাতে হবে। গবেষণা-সাবজেক্ট কি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করছে? নাকি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে? এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীকে স্পষ্ট তথ্য জানাতে হবে। ব্যক্তিগত তথ্য সমূহের গোপনীয়তার প্রশ্নে গবেষকের অবস্থান কী হবে তাও জানাতে হবে। গবেষণায় অংশগ্রহণের পূর্বে অংশগ্রহণকারীর পরিপূর্ণ তথ্য অধিকার থাকতে হবে। গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতিতে নুরেমবার্গ কোড রীতি অনুসরণ করতে হবে। নুরেমবার্গ কোড ঐচ্ছিক সম্মতির (Voluntary Consent) উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। উক্ত কোড অনুসারে, ঐচ্ছিক সম্মতি হলো: গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর পছন্দ নির্বাচন করার সামর্থ্য থাকতে হবে। এই সামর্থ্য ইঙ্গিত করে যে, অংশগ্রহণকারীকে কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে, প্রতারণার সাহায্যে, মিথ্যা ও বিভ্রান্ত তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাকে প্রভাবিত করা যাবে না। এমন কি ক্ষমতা প্রয়োগ ও জীবননাশের হুমকি দিয়ে সম্মতি

আদায় করা যাবে না। যে বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীর পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। উক্ত জ্ঞানের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তার স্পষ্ট বোধ ও উপলব্ধি থাকতে হবে। এসব শর্ত থাকার অর্থ হলো অংশগ্রহণকারীর সিদ্ধান্তটিকে সমৃদ্ধ করা।

সম্মতিপত্র কী ধরনের হবে?

উক্ত ফরমে যেসব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে:
প্রথমত. ক. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
খ. গবেষণাটি কেন করা হচ্ছে?
গ. কী ধরনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উক্ত গবেষণার মাধ্যমে অর্জন করা যাবে?
ঘ. উক্ত গবেষণার ফলাফল মানবজাতির কী উপকারে আসতে পারে?
ঙ. জ্ঞানের বিকাশ, ঔষধ বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ গবেষণা কী ধরনের সাহায্য করতে সক্ষম?
চ. প্রটোকলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী?
ছ. অনুমোদন: গবেষণা শুরু করার জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। অনুমোদনের জন্য গবেষণা প্রটোকল আইআরবিতে (IERB: Institutional Ethics Review Committee) উপস্থাপন করতে হবে। গবেষণা পর্ষদ (IERB) যদি প্রটোকলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন তাহলে সেটাকে বাতিলও করে দিতে পারেন।
জ. গবেষণা কাঠামো (The study design): অবগতিক্রমে সম্মতিপত্রে অবশ্যই গবেষণার ডিজাইন সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে রোগী বা অংশগ্রহণকারী জেনে যাবেন গবেষণার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে।
ঞ. ঝুঁকি ও উপকার: প্রায় সময়ই গবেষণা লব্ধ ফলাফল থেকে উপকার বা ঝুঁকি আসতে পারে। উক্ত গবেষণায় অংশগ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারী কী কী উপকার পেতে পারেন, অথবা কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তা জানাতে হবে। দায়িত্বজ্ঞান ও আস্থার সঙ্গে গবেষক তার অংশগ্রহণকারীকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি জানাবেন। গবেষক বা চিকিৎসক যেন ভয় মিশ্রিত ঢং-এ বিষয়টি উপস্থাপন না করেন। উপস্থাপনা হতে হবে একেবারেই নির্মোহ, সাদামাটা এবং কোনো প্রকার ভণিতা ব্যতিরেকে।
ট. গবেষণা বা চিকিৎসার সময়কাল: গবেষণা পরিচালনার পূর্বে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই গবেষণার সময়কাল জানাতে হবে। গবেষণার সময়কালও অংশগ্রহণকারীকে জানাতে হবে। এতে করে অংশগ্রহণকারী জেনে যাবে কখন গবেষণা শুরু হবে, আর কখন তা শেষ হবে। এ তথ্য অংশগ্রহণকারীর পরিকল্পনা ও মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে।
ঠ. ঐচ্ছিক ক্ষমতা (Voluntariness): একটি আদর্শিক বাস্তবতায় এটাই প্রত্যাশিত যে, একজন ব্যক্তির কোনো প্রস্তাব স্বাধীনভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার রয়েছে। যে কোনো প্রস্তাবনা গ্রহণের সময় অবশ্যই ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে থাকতে হবে। কোনো প্রকার চাপ বা দমন থাকা যাবে না। একই ভাবে অংশগ্রহণকারী যদি কোনো পর্যায়ে এসে অস্বস্তিবোধ করেন তাহলে সেখান থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন।
ড. ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা (Confidentiality of personal data): গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে ব্যক্তিগত অনেক তথ্য জানার প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় গবেষণার সময়সীমা, অংশগ্রহণকারীর বয়স, লিঙ্গ, কিংবা ব্যক্তির একান্ত তথ্যাদি গোপন রাখতে হয়। এসব তথ্যাদি অন্য কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না।

অবগতিক্রমে সম্মতির সীমাবদ্ধতা

অবগতিক্রমে সম্মতির একটি ইতিবাচক দিক হলো দু'পক্ষের মধ্যে সমতাভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এই সম্পর্কের লক্ষ্য হলো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দু'পক্ষকে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যের মধ্যে নিয়ে আসা। সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমরা আইনের বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করি। কিন্তু, আইনের প্রয়োগ অপেক্ষা ব্যক্তির নৈতিক বাধ্যবাধকতা ভালো সুফল আনতে পারে। এজন্য বলা হয়— সম্মতি নৈতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই শর্ত এমন যে, আইন অপেক্ষা ব্যক্তির নৈতিক বোধ-বিবেচনা, জোর প্রয়োগ অপেক্ষা সদিচ্ছা ও স্বাধীনতা, চাপ প্রয়োগ অপেক্ষা স্ব-শাসন ও আস্থা (বিশ্বস্ততা) গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সর্বোপরি স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি হলো অবগতিক্রমে সম্মতির মূল বৈশিষ্ট্য। এখানে প্রশ্ন হতে পারে সম্মতিই কি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বশর্ত? **প্রায়শই লক্ষ করা যায়— সম্মতি নেবার পরও কোনো একটি সিদ্ধান্ত অনৈতিক হতে পারে। লঙ্ঘিত হতে পারে গোপনীয়তা, লাভ ও ঝুঁকির মতো অন্যতম শর্তসমূহ। সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় দেখা যায়— সম্মতি নেবার পরও লব্ধ গবেষণা ফলাফল ব্যক্তি বা জাতিগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে সত্তর দশকে প্রকাশিত কয়েকটি গবেষণার প্রসঙ্গ** আনা যেতে পারে। জেনসেন (১৯৭২) ও আইসেন্ক (১৯৭১) তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হলো: "কৃষ্ণাঙ্গদের বুদ্ধাঙ্ক শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা স্থূল। বংশগত তারতম্যই এই স্থূলতার কারণ।" জাতিবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেবার নিমিত্তে সম্পন্ন এই গবেষণা পরবর্তী সময় যথেষ্ট আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটাও সত্য যে, জাতিগত পার্থক্য দেখিয়ে বুদ্ধি ক্ষমতার তারতম্য দেখানো একমাত্র যুক্তি নয়। কারণ যেসব কৃষ্ণাঙ্গদের গবেষণার একক বিবেচনা করা হয়েছে তাদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য ন্যূনতম সামাজিক, পরিবেশিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি পর্যাপ্ত ছিলো কি না তা সেখানে উল্লেখ ছিলো না। উক্ত গবেষণার বিরুদ্ধে নানামুখী সমালোচনা ও প্রতিবাদ উত্থাপিত হতে থাকে। যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক মাপকাঠির নিরিখে তাদের এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্ত থেকে দাবি করতে চাইছি যে, সকল সময় গবেষক তাঁর লব্ধ গবেষণাকে মূখ্য করে তুললেই হয় না। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কোনো জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে অতিশায়িত সিদ্ধান্ত কিনা, অন্যান্য সকল অপরিহার্য শর্তাদি এখানে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা তাও বিবেচ্য বিষয়। এদিক থেকে অবগতিক্রমে সম্মতি যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।

অবগতিক্রমে সম্মতির এতো সব অর্জনের পরও এর কিছু সীমাবদ্ধতাও দৃষ্টি এড়ায় না। চিকিৎসা-গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির প্রয়োগের ফলে বেশ কিছু বিভ্রান্তির মুখোমুখি হতে হয়, এ বিভ্রান্তিকে অ্যাপেলবম ও লিডজ (১৯৮২) চিকিৎসাগত বিভ্রান্তি (Therapeutic Misconception) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গবেষণা-সাবজেক্ট বা অংশগ্রহণকারী হয়তো ভাবতে পারেন, গবেষক তার পরিপূর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণ করবেন। রিসার্চ সাবজেক্টের এ প্রত্যাশার পেছনে বিদ্যমান রয়েছে গবেষকদের প্রদত্ত আশা প্রদান। সুতরাং, সম্মতির পেছনে রয়েছে বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক দোটানা। এই দোটানার কারণে সম্মতি শেষ পর্যন্ত খুব একটা সঙ্গতির দাবি রাখে না। সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে আরো কিছু সীমাবদ্ধতার কথা তারা উল্লেখ করেন:

ক. তৃতীয় বিশ্ব সাপেক্ষে গবেষণা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় যেসব সংকট রয়েছে তাই সম্মতির ধারণাকে দুর্বল করে ফেলে। অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন জনগোষ্ঠী প্রায় সময়ই অর্থনৈতিক সুবিধা ও প্রলোভনের কারণে সম্মতি দিতে পারে। এভাবে সম্মতি পরিপূর্ণ স্ব-শাসনকে উপস্থাপন করে না।

বরং অর্থনৈতিক মাপকাঠি স্ব-শাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ শেষতক সম্মতির নৈতিক চরিত্রটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়।

খ. সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতাও সম্মতির সঙ্গে জড়িত। যেমন, বিশেষ কিছু ধর্মীয় বাস্তবতায় কোনো ব্যক্তি গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে অপরাগতা জানাতে পারে। এমনকী সে দাবি করতে পারে যে, প্রযুক্ত গবেষণা কিংবা চিকিৎসা ব্যবস্থা তার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের পরিপন্থি। এরকম পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক গবেষণা এর লক্ষ্যে উপনীত হতে নাও পারে।

গ. অধিকারবাদী পরিপ্রেক্ষিত থেকে তৃতীয় মন্তব্যটি করা যেতে পারে। অবগতিক্রমে সম্মতি সাধারণত ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, তৃতীয় বিশ্বে অংশগ্রহণকারীর অধিকার ও স্বাধীনতা খুব একটা গুরুত্ব পায় না। গুরুত্ব না পাবার অর্থ হলো সম্মতির চূড়ান্ত অর্থটি তাৎপর্যহীন হয়ে যেতে পারে। এই তাৎপর্যহীন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বে অবগতিক্রমে সম্মতি কতোটা প্রয়োগযোগ্য হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবগতিক্রমে সম্মতির সঙ্গে আরো অনেক প্রাসঙ্গিক ইস্যু রয়েছে যাদেরকে বিশেষায়িত করে সুনির্দিষ্ট কৌশলের আওতায় আনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু প্রায় সময়ই সেটা করা হয়ে ওঠে না। কসমেটিক সার্জারির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। এখানেও বিশেষ ধরনের অবগতিক্রমে সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। তবে স্বাস্থ্যসেবার অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোনো ইস্যু অপেক্ষা কসমেটিকস ইস্যুটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। একারণে স্বাস্থ্যসেবার অন্যান্য খাত অপেক্ষা কসমেটিক্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অবগতিক্রমে সম্মতির স্বরূপই আলাদা। আবার গবেষণারও নানা ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় অবগতিক্রমে সম্মতির যে ধারা বা বাস্তবতা গ্রহণ করা হবে, প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে তা থেকে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এই ভিন্নতা প্রাণ-প্রযুক্তির মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। এর অর্থ হলো অবগতিক্রমে সম্মতি এক ও অভিন্ন স্বরূপে ভূমিকা রাখতে পারে না। এই ভিন্নতার ধারা অনেক সময়ই গবেষক বজায় রাখতে পারেন না। এই ব্যর্থতা কার্যত অবগতিক্রমে সম্মতিরই ব্যর্থতা। ধর্ম, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগত ভিন্নতার কারণেও অবগতিক্রমে সম্মতির ধরনও পাল্টে যেতে পারে। যেমন, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কারণে কোনো জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ বিশেষ কিছু বিষয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে অপারগ হতে পারেন। এ ভিন্নতা প্রমাণ করে যে, অবগতিক্রমে সম্মতি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে খুব একটা সহজ বিষয় নয়।

চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতির যথাযথ প্রয়োগ নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। চিকিৎসা গবেষণার প্রভূত উন্নতি হবার ফলে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা কৌশল বের হয়েছে। এতে কোনটি যথার্থ সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ চিকিৎসকের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। ধরা যাক, কোনো একটি রোগের চিকিৎসার জন্য ক, খ, গ নামে গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। ডাক্তার হয়তো ভাবছেন উক্ত রোগীর জন্য 'খ' কৌশলটি যথাযথ। কিন্তু, অন্যান্য মেডিকেলে গবেষকগণ 'ক' নামক কৌশল প্রয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন। কোনটি যথোপযুক্ত কৌশল একজন রোগীর পক্ষে বোঝে ওঠা সম্ভব নয়। এরকম দ্বৈতাবস্থায় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসককে নৈতিক সংকটে পড়তে হয়। এই সংকট অবগতিক্রমে সম্মতির একটি দুর্বলতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কারণ এতে ক্লায়েন্টের জন্য যথাযথ কৌশলটি কী তা বোঝানো খুবই মুস্কিল হয়ে যায়।

উপসংহার

গবেষণা, চিকিৎসা তথা অন্যান্য ক্ষেত্রে অবগতিক্রমে সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিকিৎসক যেন তার সাবজেক্টের প্রতি নৈতিক আচরণ করেন সে প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে কতোগুলো নীতিমালার প্রস্তাব করে থাকে। অবগতিক্রমে সম্মতির জন্য নৈতিক নীতিমালা গবেষণায়, চিকিৎসায় ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীকে স্ব-শাসিত সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। কীভাবে ন্যায়পরায়নতা, পরোপকারিতা ও শ্রদ্ধার নীতি বহাল রাখা যায় সে সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। অবগতিক্রমে সম্মতিকে বাস্তবসম্মত ও বৈধ করার জন্য অবশ্যই অংশগ্রহণকারীকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। যদি কোনো কারণে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় অংশগ্রহণকারীর অধিকার থেকে তাকে বিচ্যুত করা। এর অর্থ হবে অংশগ্রহণকারীর প্রতি অনৈতিক আচরণ করার সামিল। বাস্তবে বা অনুশীলনে অনেক সময় গবেষক ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। এধরনের সংকট হতে পারে ভাষাগত তারতম্যের কারণে, ধর্মীয় বিশ্বাসের অবস্থান থেকে, হতে পারে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন ও প্রত্যাশা থেকে। এসব সমস্যাদি অনেক সময় অংশগ্রহণকারী ও গবেষকের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার গুণগত চরিত্রটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এজন্য গবেষক, চিকিৎসক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীর প্রশ্নে খুবই মনোযোগী হতে হবে। এমনকি অবগতিক্রমে সম্মতি প্রসঙ্গে উপলব্ধিমূলক প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে। অবগতিক্রমে সম্মতির সাথে সম্পর্কিত কাগজ-পত্রাদি, তথ্য-উপাত্তে উভয়ের যথাযথ স্বাক্ষর থাকতে হবে। গবেষক বা চিকিৎসককে নিশ্চিত করতে হবে যে, কোনো কারণে অংশগ্রহণকারীর উপলব্ধির কমতি নেই।

গোটা গবেষণা চলমান অবস্থায় অংশগ্রহণকারীর প্রতি অসদাচারণ, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি তাও নিশ্চিত করতে হবে এজন্য যে, গোটা সম্মতি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীর স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনকে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত জনগোষ্ঠী অবগতিক্রমে সম্মতি বিষয়ে কতোটুকু জ্ঞান রয়েছে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী ও গবেষকের মধ্যে নির্ধারিত প্রশ্নের আলোকে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষা থেকে লব্ধ ফলাফলকে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ বাস্তবতায় অধিকাংশ গবেষকই অবগতিক্রমে সম্মতিকে গুরুত্ব প্রদান করে না। অথচ গবেষণাকে নৈতিক ও দায়িত্বশীল করার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা খুবই অপরিহার্য।

তথ্য নির্দেশিকা

Appelbaum P, Roth L, Lidz C, 1982. The Therapeutic Misconception: Informed Consent in Psychiatric Research. *International Journal of Law and Psychiatry*, 5:319-329.

Beauchamp, T.L. and Childress, J.F. (1994) *Principles of Biomedical Ethics,* 4th ed. New York: Oxford University Press.

Bulger, R.E. 2002. Research with Human Beings. In Bulger, R.E., Heitman, I., & Reiser, J. (Ed.), *The Ethical Dimensions of the Biological and Health Sciences*, pp. 117-125, New York: Cambridge University Press. Bentley JP, Thacker PG. (2004). The influence of risk and monetary payment on the research participation decision-making process. *Journal of Medical Ethics*,30: 293-298.

Brehaut JC, Lott A, Fergusson DA, Shojania KG, Kimmelman J, Saginur R. (2009). Can Patient Decision Aids help People Make Good Decisions about Participating in Clinical Trials? A Study Protocol. *Implementation Science*, 3:38.

Eysenck. H. J., 1971. *Race, Intelligence and Education*, London: Temple Smith.

Halpern et al. (2004). "Empirical Assessment of whether Moderate Payments are Undue or Unjust Inducements for Participation in Clinical Trials", *Archives of Internal Medicine*,164:801-803.

Newman E., E. Risch, and N. Kassam-Adams. 2006. "Ethical Issues in Trauma-related Research: A Review", *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics*, 1(3):29-46.

Jensen, A.R., 1972, *Genetic and Education*, USA : Harper & Row, Publishers, Inc.

Jensen, A.R., 1973, *Educability and Group Differences,* New York: Harper and Row.

Ryan RE, Prictor MJ, McLaughlin KJ, Hill SJ. (2008). Audio-visual presentation of information for informed consent for participation in clinical trials. *Cochrane Database Systematic Reviews,* 23 (1).

Reich, W. T., 1996. 'Bioethics in the United States', in, *History of Bioethics: International Perspectives*, (eds.) Dell'oro, R., and Viafora, C., San Francisco: International Scholars Publications.

Singer E, Hippler HJ, Schwarz N. (1992). Confidentiality assurances in surveys: Reassurance or threat. *International Journal of Public Opinion Research*, 57: 465-482.

WMA, 2000. "Declaration of Helsinki", World Medical Association, http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, accessed : 10 July, 2016.

Who, 1993. *International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human subjects*, Geneva : CIOMS (Council of International Organization of Medical Sciences) & WHO

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থে সম্পন্ন গবেষণার ফলাফলের অংশবিশেষ।]

ব্রিটিশ জরিপ কার্যক্রম: ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িকতার মূলসূত্র

ড.মো: আসাদুজ্জামান*

Abstract

The political aim of the British colonial government was to continue their rule in India. As a result, they introduced divide and rule policy. They also had several prejudices to govern the then Indian Subcontinent. They believed that the people of this Subcontinent were subsumed only on the basis of religion, specially the monotheistic and polytheistic believers. This prejudice reflects in the population survey that was conducted in India in 1801. This study attempts to analyze how communalism spread in India through the British Survey. The study found that all different types of believers were merged into ideologically two opposite groups. This merging brought two opposite unintended consequences i.e. strong community feelings among different groups and communalism in the Subcontinent.

ভূমিকা

উপনিবেশ স্থাপনকারী ব্রিটিশ শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিলো ভারতীয় সমাজের একতা, কেননা তারা চাইত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা। এটা রক্ষা করতে হলে তাদের প্রয়োজন ছিলো ভারতীয় সমাজের বিভাজন। ১৮৫৯ সালের শুরুতে বোম্বের ব্রিটিশ গভর্নর (লর্ড) এলফিস্টোন লন্ডনে লিখলেন, 'ভাগ কর শাসন কর এ রোমান নীতিটি আমাদের গ্রহণ করা উচিত'।[১] এর কিছু দিন পর জন স্ট্রাচি লিখেন, 'ভারতীয় জনগণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় পার্থক্যকে আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত' (Tharoor, 2016)। ব্রিটিশরা ভারতে এ নীতির প্রয়োগ শুরু করে জরিপ কার্যক্রম সূচনার মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই ইউরোপের

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

১ এটি যদিও রোমানদের ধারণা ছিল না মেসিডোনিয়ার ২য় ফিলিপের ধারণাটি রোমানরা নিজেদের করে নেন।

কয়েকটি দেশে জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। জনসংখ্যা ও তাদের দরিদ্রতা পরিমাপের ভিত্তি কি হবে এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে ১৭৫৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জাতীয় জরিপ বিল পাস হয়। ১৭৯৮ সালে টমাস ম্যালথাসের প্রবন্ধ 'An Essay on Population' প্রকাশিত হওয়ার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা সংক্রান্ত বিতর্কটি নতুন করে শুরু হলে ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্স ১৮০০ সালের ৩রা ডিসেম্বর 'ব্রিটিশ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি গণনা' নামে বিলটি পাস করে। যার প্রেক্ষিতে ১৮০১ সালের ১০ই মার্চ থেকে দশ বৎসর পর পর জনসংখ্যা গণনার জরিপ চালু হয়। শুরু থেকেই ব্রিটিশ জনসংখ্যা জরিপে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতে জরিপ এসেছে ভিন্ন রূপে। ভারতে তৎকালে জরিপ কার্যক্রম শুরু হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। উপনিবেশিক শাসকদের লক্ষ্য ছিল উপনিবেশিত অঞ্চলের জমি ও জনসংখ্যা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। ভারতে ১৮৭২ সালে জরিপ শুরু হওয়ার পরপর লর্ড মেয়োর নির্দেশনায় ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টারের সম্পাদনায় ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়ার প্রকাশনা শুরু হয়।[২] ইংল্যান্ড ও ভারতে এর ফল হয় দু'রকম। তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনের জন্য ব্রিটেনে জরিপ একটি সেকুলার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন এখানে সংযুক্ত করা হয়নি।[৩] পক্ষান্তরে ১৮৭২ সালে ভারতে জরিপ কার্যক্রমের শুরুতেই ধর্ম, জাতিবর্ণ ও নৃগোষ্ঠিগত পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নই ছিল মুখ্য। ধর্মীয় পরিচয়কেই জরিপের প্রধান উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জাতিবর্ণ, নৃগোষ্ঠী, শ্রেণিকরণ ও সাম্প্রদায়িকতা

জরিপ কেবল কোন পরোক্ষ সংখ্যাগত উপাত্ত নয়, এটি বাস্তবতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে ও শ্রেণিকরণ করে। ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশগুলোতে জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয় ও তার ভিত্তিতে প্রশাসনিক অঞ্চলের সীমানা তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেন।[৪] তারা ভারতীয়দের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। উপনিবেশিক প্রশাসকরা প্রজাদেরকে আঞ্চলিকতা, ধর্ম, সেক্ট, ভাষা, জাতিবর্ণ, উপবর্ণ, চামড়ার রঙ ইত্যাদিতে বিভাজিত করে রিপোর্ট প্রণয়ন ও জরিপ পরিচালনা করে। এ পার্থক্যগুলোকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। প্রাক-আধুনিক যুগে যেখানে নিজের 'পরিচয়ের' ব্যাপারটি ছিল অনেক হালকা, শুধু আঞ্চলিকতা কিংবা অন্য কিছুকে ভিত্তি করে কোন 'পরিচয়' তৈরি সম্ভব ছিল না। সম্রাট আকবর যেখানে সব ধর্মমতকে একত্রিত করতে আইন-ই-আকবরির মত ধর্মীয় মতাদর্শ চালুর উদ্যোগ নেন, ব্রিটিশরা সেখানে শুরু করেন বিভাজন, পার্থক্য ও শ্রেণিকরণ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সমাজে অসংখ্য সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ কিংবা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে বিভাজিত হয়ে বসবাস করে আসছিল। এ বিভাজনের সীমারেখা খুব শিথিল। ব্রিটিশ জরিপকারীরা প্রতিটি বর্ণ ও

---

[২] তুলনাটি স্মরণযোগ্য এ কারণে যে ইংল্যান্ডে জরিপ শুরু হয় পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কিন্তু ভারতে জরিপ ও গেজেট প্রকাশনার কাজ শুরু হয় একটি কর্তৃত্ববাদী উপনিবেশ স্থাপনকারী শাসকদের হাত ধরে।

[৩] ব্রিটেনে ১৯৯১ সালের জরিপে প্রথমবারের মত জাতিগোষ্ঠীর ধারণাটি সংযুক্ত হয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের ব্যাপারটি যুক্ত হয় ২০০১ সালে। আমেরিকায় ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্ন জরিপে যুক্ত করার ব্যাপারে এখনও নিষেধাজ্ঞা আছে।

[৪] ফরাসীরা যেমন তাদের উপনিবেশগুলোতে সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ শিখিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রিটিশরা উপনিবেশগুলোতে তাদের প্রজাদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। শ্বেতকায় আইরিশদেরও ব্রিটিশ রেস থেকে ভিন্ন করে রাখা হয়, এমনকি তাদের সঙ্গে আন্তঃবিবাহ ও ছিল নিষিদ্ধ। তথাকথিত কালো চামড়ার লোকেদের ব্রিটিশরা অসংখ্য জাতিবর্ণ ও ধর্মে শ্রেণিবিন্যস্ত করেন।

জাতিকে পৃথক মাথা গণনার মাধ্যমে শুমারি চালু করে। ফলে পৃথক জাতি ও বর্ণের পারস্পরিক পার্থক্যগুলো দৃঢ় ও সংবেদনশীল হতে থাকে। এই সম্প্রদায়গুলো জরিপের পূর্বে তাদের সংখ্যাগত শক্তি সম্পর্কে ছিল অসচেতন ফলে আত্মপরিচয়ের আগ্রাসী মনোভাব তাদের মধ্যে ছিল না, অন্যদের তাদের থেকে পৃথক করার কোন প্রয়োজনও তারা অনুভব করেনি। ব্রিটিশরা ভারতে এসেছে এমন একটি ক্রমোচ্চ সমাজ থেকে যেখানে শ্রেণি হচ্ছে সামাজিক পার্থক্যের মূল একক। ভারতীয় সমাজকেও তারা শ্রেণির ধারণা দিয়ে বিন্যস্ত করতে চেষ্টা করেছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের আদি বৈশিষ্ট্য, জাতিবর্ণের পৃথক গোষ্ঠিগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা তাদের (অ)জ্ঞাতসারে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে 'হিন্দু' পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তে তারা জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণের একক হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু জাতিবর্ণ ব্যবস্থা স্থায়ী কোন একক নয়, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এর রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ড্রিক'স যেমনটি বলেছেন, "উপনিবেশিক শক্তি সমস্ত সামাজিক উপাদানকে পরিমাপ করার জন্য জাতিবর্ণকে ব্যবহার করে"। এক্ষেত্রে ব্যক্তির গ্রাম, সম্প্রদায়, জ্ঞাতি, অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক মতামত ইত্যাদিকে তেমন বিবেচনায় নেয়া হয়নি যার ফলে বর্ণগত পরিচয়ের বিষয়টি প্রধান্য পায়। চর্তুবর্ণের ধারণা দিয়ে পুরো উপমহাদেশের সামাজিক অবস্থাকে বিন্যস্ত করতে যাওয়া অতি সরলীকরণ ছাড়া কিছু নয় (Throor, 2016)।

সম্প্রদায়গুলোর আত্মপরিচয়ের অস্পষ্ট ধারাটিকে উপনিবেশ স্থাপনকারীরা পরিবর্তন করে দেয় জরিপ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে। সংখ্যা ও সামাজিক বিন্যাসের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সমাজের উপর। বিশেষ করে ধর্মের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ধারণা উনিশ শতকে জনসংখ্যা গণনা তথা জরিপ কার্যক্রমের ফলাফল। সংখ্যা একটি রাজনৈতিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে বিশেষতঃ হিন্দু জনগোষ্ঠী জাতি, বর্ণ, শ্রেণি, সেক্ট নির্বিশেষে সংখ্যাগুরু হিসেবে নিজেদেরকে ভাবতে শুরু করে। মাথাপিছু লোক গণনা প্রচলনের পূর্বে কোন সম্প্রদায় নিজেদের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে অন্য সম্প্রদায়ের সমরূপ বা ভিন্নরূপ ভাবার অবকাশ তৈরি হয় নি। পূর্বে ভারতে 'হিন্দু' বলে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছিল না। যা ছিলো তা হলো শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব নামক নানা সম্প্রদায়। প্রাক-আধুনিক যুগে 'মুসলিম উম্মাহ'র কোন ধারণাও বিকশিত হয় নি। জরিপ কেবল জনসংখ্যা গণনাই করে না বরঞ্চ তা জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট বাক্সবন্দিও করে দেয় এবং নিজেদের আত্মপরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করে। উপনিবেশিক শাসনের পূর্বে ভারতীয় জনসমাজে সম্প্রদায়গত রেষারেষির নমুনা ছিল খুব বিরল। ব্রিটিশ উপনিবেশকারীরা এ সমস্ত অস্পষ্ট, অদৃঢ় সম্প্রদায়গুলোকে প্রথমে সংখ্যাগত ও পরে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে পরিণত করে। 'ভাগ কর শাসন কর' এ নীতিটি ১৮২১ সালের শুরুতেই ভারত শাসনের ভিত্তি হিসেবে স্থান পায়; ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সংস্কারের মাধ্যমে এর বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয়। বিশ শতকের সম্প্রদায়গত মানসিকতার পেছনে ১৮৭২ সাল থেকে শুরু হওয়া জরিপ কার্যক্রম তাই অনেকাংশ দায়ি।

জরিপের ফলাফলগুলো ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ভৌগোলিক পরিচয়কে চিহ্নিত করে। ধর্মের ভিত্তিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িকতার বড় উদাহরণ। আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে জন্ম দেয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো রাজনৈতিক চালের গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে পৃথক ভোটদানের ব্যবস্থা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা

সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক উত্তেজনার জন্ম দেয়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তৎকালীন বড়লাট মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে স্থানীয় পরিষদে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে মুখ্য করে তুলে। এমনকি পাঞ্জাবের লাহোরে মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও হিন্দু, মুসলিম ও শিখ আসনের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল যথাক্রমে ৪০:৪০:২০ অনুপাতে। এ সকল বিষয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার দূরত্বকে বাড়িয়ে দিতে থাকে। ফলে একদল অপরদলের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার সম্প্রদায়গত বিভাজন বাড়তে থাকে এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি হয়। অথাৎ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রদায়গত বিরোধ একটি আধুনিক প্রপঞ্চ, ১৮৮০ সালের পূর্বে যার অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংজ্ঞাকরণ ও সাম্প্রদায়িকতা

পরের দিকের জরিপগুলোতে জরিপ কর্মকর্তারা ধর্মের সংজ্ঞার ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণকে শ্রেণিবদ্ধ করার ব্যাপারে জনগণের প্রতিরোধের মুখোমুখি হন (Bhagat, 2001)। সেন্সাস অফিসাররাও এ ব্যাপারে তাদের সতর্কতা জানিয়েছিলেন যে, জরিপের পরিসংখ্যানিক তথ্যসমূহ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক দূরত্ব তৈরিতে সহায়তা করছে।[৫] ১৯১১ সালের সেন্সাস কমিশনারের একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো: 'ভারতে ধর্মীয় পার্থক্যের থেকে সামাজিক পার্থক্যকেই গুরুত্বের সংঙ্গে বিবেচনা করা হয়. এখানকার মানুষ প্রতিবেশীর ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়ে তার সামাজিক মর্যাদা ও জীবন-যাপন পদ্ধতিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। প্রতিবেশী কি বিশ্বাস করে তার থেকে সে কি খায় কিংবা তার হাতে জল গ্রহণ করবে কিনা সেটাই তার কাছে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়।' পাশ্চাত্যেও উপনিবেশকারীদের মানসিকতা ছিল বর্ণবাদী।

প্রতিটি শ্রেণিকরণে জরিপ কর্মকর্তারা বহু ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। প্রদেশগুলোর জরিপ কিংবা সর্বভারতীয় রিপোর্টসমূহে ভারতীয় সমাজের সম্প্রদায়গুলোর আন্তঃমিশ্রণের এমন সব উদাহরণ সন্নিবেশিত থাকত যেগুলোকে জরিপের শ্রেণিকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। যেমন হিন্দুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, "ভারতের অধিবাসী যে কিনা ইউরোপীয়, আর্মেনিয়, মোগল কিংবা পারস্যের কোন বংশধারা থেকে উদ্ভূত হয়নি। যে কিনা একটি নির্দিষ্ট বর্ণের সদস্য, যে ব্রাহ্মণের আধ্যাত্ম শক্তিকে স্বীকার করে নেয়, গোমাংশ ভক্ষণ করে না ও ব্রাহ্মণের নির্দেশনা মান্য করে।" হিন্দু সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করতে তাদেরকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপরীতে সম্পর্কিত করে সংজ্ঞা দেয়া হয়। উত্তরপ্রদেশ, আগ্রা ও অযোধ্যার সেন্সাস সুপারিন্টেডেন্ট জর্জ গ্রিয়ারসন বলেন, 'হিন্দি বলতে যে কোন ভারতীয়কে আর হিন্দু বলতে অমুসলিম ভারতীয়কে বুঝায়।' জরিপ বা সেন্সাসগুলো শুধু 'হিন্দু'দেরকে সংজ্ঞায়িত করেনি এগুলো আসলে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছে 'প্রকৃত হিন্দুকে'। ১৯১১ সালের জরিপে বিভিন্ন প্রদেশের জরিপ তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি নির্দেশ ছিল সে সমস্ত হিন্দু বর্ণ ও উপজাতিগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য যারা ১) ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বকে মানে না ২) ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন

[৫] পাশ্চাত্যেও তাত্ত্বিকদের ধারণা ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম আর পাশ্চাত্যে ধর্মকে সংস্কৃতি থেকে আলাদা করা হয়েছে। এ কারণেই তারা ভারতের ক্ষেত্রে সেন্সাসে ধর্মীয় পরিচয়কে রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন যদিও প্রাচ্যবাদীরা এ ধরনের ধারণার সমালোচনা করেছেন।

হিন্দু গুরু থেকে মন্ত্র নেয় না ৩) বেদের কতৃত্বকে মানে না ৪) সার্বজনীন হিন্দু দেব-দেবীদের মানে না ৫) পারিবারিকভাবে কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব নেই ৬) কোন ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বে বা নিয়ন্ত্রণে নেই ৭) সাধারণ হিন্দু মন্দিরে যাদের প্রবেশাধিকার নেই ৮) যারা স্পর্শ বা অন্য কোন ভাবে অপবিত্র করতে পারে ৯) যারা মৃতদেহ কবরস্থ করে ১০) গোমাংশ ভক্ষণ করে ও গোবৎসকে যথাযথ সম্মান জানায় না। এ বিশেষণগুলোর প্রয়োগ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম। মধ্য প্রদেশ ও বিহারে বহু হিন্দু ধর্মালম্বী ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না, বেদ মানে না। প্রায় অর্ধেক হিন্দু জনগোষ্ঠী কোন গুরু থেকে মন্ত্র নেয় না বা ব্রাহ্মণের শিষ্য নয়, চার ভাগের এক ভাগ লোক সর্বভারতীয় কোন দেবতার পূজা করে না। তিন ভাগের এক ভাগ জনগোষ্ঠী মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না, এক চতুথাংর্শ লোকের স্পর্শ দ্বারা অন্যেরা অপবিত্র হয় বলে বিবেচনা করা হয়, এক সপ্তমাংশ লোক মৃতদেহ কবরস্থ করে, প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী মৃতদেহ দাহ করাকে অত্যাবশ্যক মনে করে না এবং এক-পঞ্চমাংশ লোক গোমাংশ খায় (J. T. Marten, 1911)। প্রকৃত হিন্দু বলা হয়নি কিংবা এদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে রূপান্তরিত হিন্দু বলে । কিন্তু এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যাদেরকে হিন্দু বলা হচ্ছে তারা সবাই সমরূপ গোষ্ঠী নয় এবং এদের মধ্যে বহু ধরনের ভিন্ন ভিন্ন রীতি ও আচরণ রয়েছে। এটা সত্য যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। অনেক হিন্দুধর্মাবলম্বী যাদের ধর্ম চর্চার মধ্যে ইসলামী রীতি ও ভাবাদর্শের প্রভাব রয়েছে। যেমন 'ডাফালি ফকিরে'র শিষ্য যারা পাঁচ জন অজানা ইসলামী পীরের উদ্দেশ্যে তাদের গৃহস্থালীর পশু-পাখি বিসর্জন দেয় যেটা 'পঞ্চপ্রিয়' কাল্ট হিসেবে পরিচিত। গুজরাটে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যাদের একটি হচ্ছে 'মাটিয়া কুনবিস'— যারা তাদের প্রধান উৎসবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখে কিন্তু তারা ঈমাম শাহ ও তার বংশধরদের অনুসারী এবং তারা মৃতদেহ দাহ না করে কবরস্থ করে। 'শৈখাদাস'রা তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে হিন্দু পুরোহিতের পাশে মুসলমাম ঈমাম রাখে, 'মোমনাস'রা খৎনা করায়, মৃতদেহ কবরস্থ করে ও গুজরাটি কোরআন পাঠ করে আবার অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রচলিত আচার-আচরণ পালন করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে জৈন ও শিখদের পার্থক্য খুব আপেক্ষিক। ভারতের কেন্দ্রীয় প্রদেশ ও বিহারের তৎকালীন সেন্সাস কমিশনারও স্বীকার করেছেন, 'বাস্তবে সেন্সাস অফিসাররা ভারতীয় জনগণের জটিল বহুবিধ ধর্মীয় পার্থক্যকে (ইংরেজদের) নিজেদের মত করে শ্রেণিকরণ করেছেন। জরিপকারীরা প্রত্যেককে তাদের প্রথাগত ধর্মীয় পরিচয় (হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রিষ্টান) জিজ্ঞেস করেছে । যারা এই প্রথাগত ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্যে ছিলনা তাদেরকে বর্ণ বা গোত্র অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। তথ্য সারণিবদ্ধকরণের সময় যদি এরা কোন ধরনের হিন্দু জাতিবর্ণের সংঙ্গে সম্পৃক্ত থাকত তাহলে তাদের হিন্দু অথবা অন্য কোন শ্রেণিতে অর্ন্তভুক্ত করা হতো' (J. T. Marten, M. A., 1911) ।

এটা স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, উপনিবেশিক জরিপ কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হতো উপনিবেশিকদের বর্ণবাদী মানসিকতা দিয়ে ধর্মীয় গোষ্ঠিগুলোকে সংজ্ঞায়িত করায় ভারতীয় সমাজের গঠন ক্রমশঃ পাল্টে যেতে থাকে। এই সংজ্ঞাকরণগুলো এমনভাবে করা হয় যাতে এদের পারস্পরিক আন্তঃমিশ্রণকে অস্বীকার করা হয়। ফলে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভাজন বাড়তে থাকে। আবশ্যিকভাবে তা 'ভাগ কর শাসন কর' এ নীতির সংঙ্গে মিলে যাওয়ায় উপনিবেশিক শাসন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় ।

তথ্যসূত্র :

Bhagat, R. B. (2001). Census and the Construction of Communalism in India. *Economic and Political Weekly*, *36*(46), 4352–4356.

J. T. Marten, M.A., I. C. . (1911). *Census of India 1911, Part l* (Vol. X). Calcutta: Superintendent Goverment Printing, India.

Tharoor, S. (2016). *An era of darkness: the british empire in India*. New Delhi: Rupa Publications India.